সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রণীত

হ্ব

কলকাতা-২৯

১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

নিউস্ক্রিপ্ট

প্রথম সংস্করণ। আশ্বিন, ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক : সুচরিতা দাশ

নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : সন্তোষকুমার ধর। ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

ব্লক : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭।১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক : দি নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা-১৩

বাঁধাই : ইস্টএণ্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

'বৃত্ত'

১৯৪০-এ লেখা।

সে-সময়কার

একদল বুদ্ধিজীবীর পরিবেশ

এখানে ধরা আছে।

আজ এ-রচনার কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়ত চলে,

কিন্তু কথাগুলো পরিবর্তিত হলে

১৯৪০-এর কলকাতা

বইটি থেকে হারিয়ে যাবে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

এক

২১শে জুন   রাত্রি ৮টা
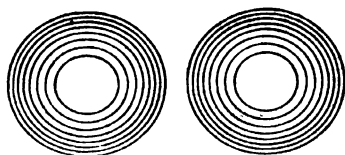
চিঠিগুলো যেন পৃথিবীর পুরোনো দিনের কয়েকটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিত। মিশরের বা মহেঞ্জদরোর আঁকাবাঁকা চিত্র-লিপি। চল্লিশ বছর আর চারহাজার বছর পৃথিবীর কাছে সমান—পুরোনো, একই রকম। শুধু মানুষের কাছে অতীত সীমার মাপে ধরা দেয়। মানুষের বর্তমানের এঞ্জিন অতীতের কয়েকটা মালগাড়ীকে সঙ্গে জুড়ে নেয়—তার বর্তমানে তারা খানিকটা বর্তমান হয়েই বেঁচে থাকে; যদিও ছায়ার মত, তবু তাদের নিশ্বাসে উষ্ণতা আছে। একটা চিঠিতে সত্যবান তার মায়ের নিশ্বাস শুনতে পেল। গাছগাছড়ায় তৈরী কালির রং আলোবাতাসের রাসায়নিক ক্রিয়ায় কবে মুছে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—আছে শুধু কতকগুলো লোহাটে দাগ, পাখনার কলমে মোটা, ছিৎরানো। তাতেই সত্যবান দেখতে পায় তার মা আলপনা দেবার মত করে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে গেছেন, বারবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন এ'ক'টা কথার উপর—পাছে ভাষায় ভুল থেকে যায়।

পুরু প্লাস্-পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে সত্যবানের চোখগুলো দেখা যাচ্ছে আগ্রহে অমানুষিক। কোনো রাসায়নিক যেন মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে মারাত্মক রোগ-বীজাণুর উপর তাঁর আবিষ্কৃত অষুধের ক্রিয়া দেখছেন। সে-চোখে কতকটা কৌতূহলেরও

আতিশয্য পাওয়া যাবে যা প্রায় অশ্লীল। কোনো অ্যামেচার ফটোগ্রাফার যদি অন্ধকার ঘরে নগ্ন মেয়ের ছবির প্রতিলিপি তোলে—তেম্নি।

মার চিঠি সত্যবানের কাছে লেখা নয়, তার বাবার কাছে লেখা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছাপ আঁকা ছোট সরু খামেই আবার ভাঁজ করে তুলে রাখে সত্যবান। সন্তর্পণে একপাশে রেখে দেয়, সন্তর্পণে মার স্পর্শটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়। একটা মাত্র খবর অমূল্য মনে হয় সত্যবানের কাছে। 'সতু কথা বলতে শিখেছে—ঠোঁট কুঁচকিয়ে 'ম্মা—ম্মা'ত বলেই, তোমাকেও ডাকতে চায়।'

এ-চিঠি লেখার দিনে সত্যবান কথা বলতে পারত না। বিশ্বাসই হয় না সত্যবানের। বোবা, পঙ্গু, অসহায় একটা ছোট্ট মানুষ যে সে কোনদিন ছিল ভাবতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। সেই ছোট্ট মানুষটা যে চল্লিশ বছরে আজ এ-মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে তার কোনো প্রমাণই সে শরীরে, মনে, রক্তে বা চিন্তায় খুঁজে পায় না। সে-সময় আর সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার কাছে একই রকম ঐতিহাসিক—তাকে আলাদা করে শারীরিক হিসেবে কিছুতেই আনা যায় না। সে সব মুহূর্তগুলোর মৃদু স্পর্শ বা উপদ্রব শরীরে কোথাও আছে ত নিশ্চয়ই কিন্তু এখন তা এম্নি চিহ্নহীন যে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে বাবা-মা বেঁচে থাকলেও তাকে অনায়াসে অস্বীকার করা যায়। সেটা অকৃতজ্ঞতা নয়, বিস্মৃতি—পরিপূর্ণ বিস্মৃতি। মানুষের বিচার-বোধ মাত্র তখন শৈশবের একটা কঙ্কাল খাড়া করে তুলতে পারে—কিন্তু তাকে রক্তমাংস দেবার ক্ষমতা বিচার-বোধের নেই।

সাক্ষী দেবার জন্য মা-বাবা বেঁচে নেই সত্যবানের। (এ যেন কতকটা তার সৌভাগ্যই)। আছে শুধু চিঠির একটুমাত্র কথা।

ওটুকু কথাই তার কল্পনার সঙ্গে মিশে কতকগুলো জীবন্ত মানব-কোষ তৈরী করতে শুরু করে। আবেগের উত্তাপে তা ক্রমে শৈশবের ভ্রূণ হয়ে ওঠে।

এই ভ্রূণকে যতটা নিজের সত্তা মনে হয়, একটা গ্রুপ ফটোতে মায়ের কোলে ফ্রক-পরা নিজের চেহারাটাকেও ততটা তার আপন মনে হয় না। ঐ একটা আকৃতিহীন, পুতুলের মত বোকা চোখমুখের মাংসপিণ্ড সত্যবান কখনও যেন ছিল না। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে মনে মনে সজোরে সে-অস্বীকার সত্যবান উচ্চারণ করে। তা-ই সত্যবানের অসহ্য মনে হয় যে ফটোর কদাকার শিশুটা অন্যের সেবায় যত্নে আদরে লালিত—স্তিমিত তার প্রাণশক্তি। আর সত্যবানের গড়া ভ্রূণে অদ্ভুত প্রাণ-চাঞ্চল্য, সূক্ষ্ম অণু-কোষগুলির গতিবেগ, স্পন্দন—আশ্চর্য! তার জীবন্ততা স্পষ্ট প্রখর একটা রূপ নেবার জন্য আকুল।

আরেকটা চিঠি। পোস্টাফিসের সীলে সন আঁকা ১৯১০। বাবা লিখছেন মার কাছে। 'সতুকে বলো লেখাপড়া না করে শুধু দুষ্টুমি করে বেড়ালে মখমলের কোট আর প্যান্ট এবার আর ওর তবে হল না।'

আট বছরের সতুকে ধন্যবাদ। স্কুলইন্‌স্পেক্টরের কাছে কোনো ছেলে প্রশংসা পেলে হেডমাষ্টারের মুখ যেমন অহেতুক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি উজ্জ্বল হল সত্যবানের মুখ। সে মনে মনে ত্রিশবছর আগেকার সত্যবানকে ধন্যবাদ জানালে। অপরের নির্দেশের অত্যাচারকে উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা ঐটুকু ছেলের ছিল। মায়ের আদেশে গবেষকদের মত অখণ্ড মনোযোগে একটা বই নিয়ে বসে যাওয়াই শিশুর চরিত্রহীনতা। আলোবাতাস আকাশমাটির সঙ্গে যখন শিশুর পরিচয় হয়ে গেছে তখনই তার রোগমুক্তি—

জ্রণের দুরন্ত জীবন তখনই আবার সে ফিরে পায়। এবার তার খেলাঘর জরায়ুর সঙ্কীর্ণ পরিসর নয়—চোখ দিয়ে যতটুকু পৃথিবী আবিষ্কার করা যায় ততটুকু পৃথিবী। সেখান থেকে তার মনে রং আসে, তার মন থেকে সেখানে রং যায়—সে রং-এ পৃথিবী বড় হতে থাকে, যতটুকু সে আছে তার চেয়েও বড়, যা তার নেই তা-ও তখন তার থাকে। পাম্প করে করে একটা ফুটবলের যেন আয়তন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—ডি-সিটারের এক্সপাণ্ডিং ইউনিভার্সের মত। তার সঙ্গে যে মনের পাল্লা, তাকে কি বইয়ের কয়েকটা রঙীন ছবি আর কালির হরফ বা মখমলের লোভ দেখিয়েই ধরে রাখা যায়?

আট বছর বয়েসের একটা ক্ষীণ দুর্বল রক্তের স্রোত তার মগজে স্মৃতির স্নায়ুগুলোকে একটু যেন উত্তেজিত করে তোলে। টেবিলের উপর কনুই গেড়ে সত্যবান মাথার ভারটা হাতের উপর ঢেলে দেয়। তারপর চোখ বুঁজে একটা ছবি মনে করতে চায়। বেনিয়ান গায়, সাদা হাফপ্যাণ্ট পরা আট বছর বয়সের সতু মগজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যবানের চোখের অন্ধকারে চলাফেরা করতে শুরু করে। কোত্থেকে সে এক সঙ্গীও জুটিয়ে আনে—আদুল গা, ধূলার ময়লায় প্যাণ্টের আসল রংটা চেনা যায় না। বোঁজা চোখের পেশীগুলোকে কুঁচকে কুঁচকে নামটা ওর মনে করতে চেষ্টা করে সত্যবান—তিনু-দীনু-তি-টি-টিপু। টিপু। দুটো বাঁশের বাখারি হাতে নিয়ে দুজন এঁদোপুকুরের, কাঁচা ড্রেনের ধারে ধারে সমস্ত দুপুর কচুগাছ কুপিয়ে বেড়াচ্ছে।

কচুর লতা দেখিয়ে বলছে সতু: "জানিস টিপু, ওগুলো সাপ—" বাঁশের তলোয়ারে নরম কচুর ডগার সঙ্গে গলদঘর্ম হয়ে যুদ্ধ চালাতে চালাতে নেহাৎ অবিশ্বাসেই টিপু সতুর কথাটা উড়িয়ে দেয়: "যাঃ—"

"এখন ওগুলি আছে কিনা তা-ই। রাত্তিরে এগুলোই সাপ হয়ে বেরোয়—"

রাত্রিতে ঘুমোবার আগে সতুর সত্যি মনে হত কচুর লতাগুলো নড়ে উঠছে—গায়ে চক্কোর—মাথায় ফণা—আর হিস্ হিস্ আওয়াজ। হাতপাগুলো আস্তে আস্তে গুটিয়ে এনে সতু ভয়ে কুঁকড়ে থাকত। কিন্তু তাতেও বা কি? চারদিকেই যে সাপের রাজ্য—কিলবিল করছে অদ্ভুত, ঠাণ্ডা, লিকলিকে ভয়ঙ্কর চেহারাগুলো। মশারির দড়ি ঝুলে আছে, তার ছায়া নাচে মশারির দেয়ালে—মনে হয় সতুর তা-ও যেন সাপের শরীর। হিমসিম খেয়ে কখন সে ভাগ্যিস ঘুমিয়ে পড়ত নইলে সাধ্য ছিল কি সাপের হাত থেকে নিস্তার পায়।

ভোর হয়ে গেলে মশারির দড়ি দড়ি হয়েই দেখা দিত। তবু এদের দিয়ে বিশ্বাস নেই। "এত ভয় দেখায় এরা!"—একটা পেন্সিল-কাটা ছুরী নিয়ে পটপট করে মশারির সমস্ত দড়ি কেটে ফেলত সতু। তাতেও রক্ষা নেই। দড়িগুলোকে কুচিকুচি করে হাতের চেটোয় ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে তবে সতু নিশ্চিন্ত। ব্যাপারটা হয়ত মা এত আগে টের পেতেন না যদি না দড়ি কাটতে সতুর আঙুল থেকে এক চিলতে মাংস উড়ে গিয়ে বেসামাল রক্ত পড়তে শুরু করত।

কোনো একটা অদৃশ্য সেলুলয়েডের ফিতেয় যেন গাঁথা আছে ছবিগুলো। সত্যবানের চোখের উপর দিয়ে তা দ্রুতগতিতে চলে যায়। মনে মনেই একটু হেসে ওঠে সত্যবান। তবু ঠোঁটের ধার ঘেঁষে হাসির কয়েকটা ছোট ছোট সুন্দর রেখার আভাস পড়ে।

আবার চিঠির তাড়ায় হাত দেয় সত্যবান। আবার আগ্রহ আসে চোখে। পুরু কাঁচের নীচে কাঁচের মত চোখগুলো তার চকচক করে ওঠে।

রজত, বিমল, সুপ্রিয়র চিঠি। চিঠির আঁকাবাঁকা হরফে ইস্কুলের দিনগুলো যেন হাত বুলিয়ে গেছে। এক একটা চিঠির পেছনে তখন কত প্রতীক্ষা ছিল—আনন্দের এক একটা উচ্ছ্বাসের মতই এরা এসে হৃদপিণ্ডে ধাক্কা দিয়েছে। রেডিয়াম এখন সীসা—আর তার উত্তাপ নেই, আলো নেই। তবু সেই অপসৃত আলো-কে প্রাণপণে স্মরণ করে সত্যবান। গরমের ছুটিতে যখন সুপ্রিয় চলে যেত সিলেট, পূজার ছুটিতে রজত কলকাতা, বিমল চাটগাঁতে কী ভীষণ মন খারাপ যে হত সত্যবানের, লুকিয়ে সে কাঁদতও হয়ত! চুপ করে থাকত মুখ কালো করে, বাবা মা ভাবতেন কি অসুখ বুঝিবা হবে। সে অসুখের অষুধ ছিল এ চিঠিগুলো। এখনকার মস্ত, চৌকো, আঁটসাঁট মুখটার বদলে রজতের সেদিনকার রোগাটে মত, নরম ফুটফুটে মুখের চেহারা মনে করে সত্যবান! মনে পড়ে বিমলের অদ্ভুত কালো চোখগুলো, পাতায় ঘন কালো চুল—মনে হত চোখে কাজল দিয়ে আছে। রোদ-সরে-যাওয়া নিরুৎসাহ বিকেলের মত মনে সুপ্রিয়র মেয়েলি মুখটাও স্মরণ করে সত্যবান। অভিমানে ওর ঠোঁটগুলো আশ্চর্য রকম ফুলে উঠত—কেমন নরম অথচ রুক্ষ দেখাত! অনেক সময়ই তখন ভেবেছে সত্যবান ওকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। কিন্তু মাত্র দু বছর। সুপ্রিয় সম্বন্ধে যে নরম অনুভূতিগুলো শিকড় চালিয়ে তার সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করে ছিল, একটা সময়ে আর তারা অনুকূল আলোবাতাস পেল না। থার্ড ক্লাশে তখন বিমল এসে ভর্তি হয়েছে। দু বছরে বিমলও শুকিয়ে গেল সুপ্রিয়র মতই। তারপর রজত। রজতের মনকে অদ্ভুত মনে হত সত্যবানের। যেন এস্‌বেস্‌টসের পোশাকপরা। মনের উত্তাপ কিছুতেই যেন ঠিক মত পৌঁছুত না রজতের সুরক্ষিত মনে। অনেক উপাদান অনেক রকম উপকরণ নিয়ে সত্যবান সেখানে প্রবেশ

করতে চেয়েছে—কিন্তু ঝড়জলে শীতগ্রীষ্মে রজতের মনের ব্যারো-মিটারের দাগ একই রয়ে গেছে—একটু চঞ্চলতাও দেখায় নি। সত্যবান বুঝতে পেরেছিল উচ্ছ্রিত আবেগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—অনেকটা সোডাওয়াটারের মত—ব্লিৎস্-যুদ্ধের শেষে শোচনীয় শ্রান্তির মত। নিতান্ত নিস্তেজ দেখালেও স্রোতেরই টিঁকে থাকবার ক্ষমতা বেশি। মানসিক নিস্তেজ চেহারা নিয়েও রজত টিঁকে গেল অনেক দিন। সজ্জন বন্ধু রজত। সুপরিচিত ভদ্রলোক রজত।

নিস্পৃহ আঙুলে নীলচে খাম থেকে আরেকটা চিঠি বার করলে সত্যবান। সতীর চিঠি। প্রথম চিঠি। সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে ও তখন কলকাতায়—আই-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে বড়দিনে সত্যবান বাড়ি এসেছে। তখনও তা প্রেম-পত্র, স্ত্রীর পত্র নয়। সত্যিকারের প্রেম-পত্র—মেয়ের কাছ থেকে পুরুষের কাছে এসেছে। সুপ্রিয়র চিঠির মত এ নয়—যার ভালবাসা একটা অনির্দিষ্ট, অহেতুক ভাললাগা মাত্র। সতীর চিঠির ভাষার পেছনে যে আবেগ তা মানুষের তীব্রতম অনুভূতির গভীর রং-এ রঙীন। স্মৃতির মত ফিকে অথচ আচ্ছন্নকর যৌনতার প্রথম স্পর্শ এ-চিঠি।

"তোমাকে হারাবার ভয় নেই—তবু যখন কাছে থাক না ভয় হয়—" এত সুন্দর করে বলতে পারত সতী তখন? অকপট অনাবৃত মন ভাষা তার আপনি থেকে তৈরী করে নেয়। অস্পষ্ট মনকে কুশলী হাতও ভাষা তৈরী করে দিতে পারে না—আজকালকার সাহিত্যিকদের কথা ভাবে সত্যবান। মনের সঙ্গে তাদের আদর্শের বোঝাপড়া হয় নি তাই তাদের ভাষা বিষম খায়। "তবু যখন দূরে থাক—তোমাকে সত্যি করে আমি পাই। চিঠিতে ত বলতে পারি তোমাকে কতটা ভালবাসি। যখন সামনে থাক মনের কথা বলা যায় না—চারদিকে পাহারা, ভীড়, বাধা।" কথাগুলোর সৌন্দর্যেই

সত্যবান চিঠিটা পড়তে থাকে। সত্যি, প্রেমের চেয়ে প্রেম-পত্রের দাম অনেক বেশি। সত্যবান মনে মনে বৈঠকী আলোচনা করে যায়। ঠোঁটের অদ্ভুত রেখাগুলো দেখলে মনে হয় যেন টুটেনখানম হাসছে। তুমি ভালবাসছ যে মেয়েকে তাকে যদি নিঃসঙ্গও পাও সান্নিধ্যের উত্তাপেই তোমরা অভিভূত থাকবে—তখন প্রেম একটা বিমূর্ত বোবা অনুভূতি, তোমার মন স্পিডোমিটারের কাঁটার মত দুলছে, দেখবে যত কথা বলার ছিল কিছুই ত খুঁজে পাচ্ছ না। কিন্তু যখন তুমি চিঠি লিখছ, তোমার তীব্র উপলব্ধি আর সজাগ, মুক্ত মন প্রেমের সত্যিকারের চেহারাটা প্রত্যেক ছত্রে আবিষ্কার করে চলে। অনুভূতিকে তখন তুমি কাঁটায় কাঁটায় মাপতে পার, অনেক সময় খরচ করে তাকে ভাষা দিতে পার। প্রেম একগ্লাস মদেরই মত তুমি যা সামনে নিয়ে বসে আছ—প্রেম-পত্র ঠিক তাই, যেন একচুমুকে সে-গ্লাস শেষ করে তুমি নেশা করেছ।

টুটেনখানমের মত হাসি নিয়েই সত্যবান চিঠিটা আবার খামে পুরে ফেলে। সে-হাসি নিষ্ঠুর নয়, চাপাকান্নার মতও নয়—কেমন যেন পুরোনো আর বীভৎস। অনেক দিন মাটির নীচে রাখা তামার বাসনকে ঘষে মেজে তুলে রাখলে এম্নি বীভৎস দেখায়।

চিঠির ড্রয়ারটা ঠেলে দিতেই সত্যবানকে একটু যেন ক্লান্ত মনে হয়। কপালে একবার সে হাত বুলিয়ে নেয়। টেবিল ল্যাম্পের আলোটা এখন তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। চোখদুটো একটু অন্ধকার চায়। সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিলে সত্যবান। 'আঃ'। একটা দীর্ঘ গোলমেলে দৃশ্যের শেষে যেন রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-পাত হল। নিজেকে নিজের বর্তমানের মধ্যে পাবার অগাধ স্বস্তি! টেবিলের উপর একটা সিগারেট ঠুকছে সত্যবান। দেশলাইটা জ্বালতে ইচ্ছা করছে না। আলোর ভয়। এখন তার অন্ধকার

দরকার, বেশ ঘন, গাঢ় অন্ধকার। শুধু চোখেরই নয়। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো অন্ধকারে স্নান করে নিক। ফ্যানের আওয়াজে আর হাওয়ায় সমুদ্রের আবহাওয়া আসুক।

ভেতরদিকের দরজার পর্দা সরিয়ে একটা ছায়া এসে ঘরে ঢুকল। এ ছায়াতে সত্যবানের কৌতূহল নেই। ছায়ার প্রত্যেকটি অস্পষ্ট রেখা তার কাছে মুখস্তের মত বিরক্তিকর। হাতের বাটিতে দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠিটা ঢুকিয়ে ঠোঁটের সিগারেট তার দিকে বাড়িয়ে দিলে সত্যবান। হাওয়ায় আগুনের কয়েকটা ফুলকি উড়ে গেল।

"তুমি এখানে বসে আছ—বেরোও নি?"

সতীর না জানবার কথা নয় সত্যবান যে বেরোয় নি। এতক্ষণ সে এমন কিছু স্বর্গে ছিল না। এ-ঘরে বাতি জ্বলছে কেন, আর সত্যবান বাতি জ্বালিয়ে কি করছে তা দেখবার নির্লজ্জ কৌতূহল সতীর থাকা উচিত এবং তার জন্য সে হয়ত পর্দার ওধার থেকে উঁকি দিয়েও গেছে। আর সে কৌতূহল যদি সতীর না হয়ে থাকে তবে সত্যবানের প্রতি সতীর নিস্পৃহতার অপরাধও কম গুরুতর নয়। অসহিষ্ণুতায় সত্যবান কেবল একগাল ধুয়ো উড়িয়ে দিলে।

"বাব্বা, অন্ধকারে কি করে যে বসে আছ—" সিলিং-বাতির সুইচটা টিপে দিলে সতী। সতীর মেদ-বহুল চেহারায় যৌবন নিশ্চিহ্ন। যেমি সত্যবানের চোখের দৃষ্টিতে বার্দ্ধক্য ছায়া ফেলেছে। তবু চোখের আর ঠোঁটের এনাটমিতে সত্যবান এখনও যুবক। মনের উদ্দাম চলা ত শেষই হয় নি। বয়সে তিন বছরের ব্যবধান নিয়েও সতীর ঝিমুনি এসে গেছে কবেই। দশ বছর আগে থেকেই লক্ষ্য করে আসছে সত্যবান, সতী মনের ঘোড়ার রাশ টেনে চলেছে। এখন তার জীবনে ফুলষ্টপ।

"লিখছিলে কিছু?" একটু দূরে একটা চেয়ারে শরীরটাকে গুঁজে দিলে সতী।

"না—" ভীষণ ওজনের শব্দ হল সত্যবানের ঐটুকু কথায়।

"কাল তোমার কলেজ ছুটি? নিউ মার্কেটটা ঘুরে আসতে তা হলে—খুকী বলছে ও-ফ্রক কিছুতেই পরবে না—"

"খুকীকে নিয়ে তুমিই যাও না কেন?" মামুলি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মত নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

"মার্কেটে-টার্কেটে টইটই করতে আমার ভাল লাগে না—"

সতী তখন বি-এ ক্লাশে পড়ে, সত্যবান ইকনমিক্সে থিসিস তৈরী করছে। কলেজ থেকে সত্যবানের মেসে চলে আসত সতী। দুজনে তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত নিউমার্কেটে এটা-ওটা কিনে। ফুরফুরে হাওয়ার মত চলত সতীর পা—পাখীর মত অফুরন্ত বেজে চলত গলা। একটা ফ্রেমে বাঁধা আছে যেন ছবিটা, পুরোনো —তাই চোখ দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় শাণিত রাখতে হয়। তেম্নি চোখে সত্যবান সতীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। জড় মাংসপিণ্ডের উপর টকটকে লাল সিঁদুরের একটা মস্ত ফোঁটা। সতীত্বের নির্লজ্জ ইঙ্গিত। এ-যেন একটা হাস্যকর বিজ্ঞাপন—'আমার স্বামী আছে, তোমরা দেখতে পার তার প্রতি আমি কত অনুরক্ত!'

বিশ্রী চুপচাপে কাটল খানিকটা সময়। ফ্যানটা ভোমরার আওয়াজ করে যাচ্ছে। সত্যবানের দিকে নিবিড়ভাবে চেয়ে থেকে একটা পা নাড়ছিল সতী: "কি—কেবল চুপ করে বসে আছ!"

সতীর মাংসল উরুর আকারহীনতা চোখকে পীড়া দেয়। সত্যবান মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"বারে, বোবা হয়ে গেলে নাকি?" সতী হাসলে।

গালের পুরু মাংস ঠেলে হাসির রেখাগুলো সূক্ষ্মতায় মৃদু হতে

পারে না। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরেরও মৃত্যু হচ্ছে সতীর। সত্যবানও একটু হাসল। যেন মৃতের তর্পণ করছে।

"খুকী ঘুমুচ্ছে?" বর্তমানকেই সহজভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করল সত্যবান।

"শুইয়ে দিয়ে ত এলুম—"

"খোকা?—"

"জিওমেটি র একষ্ট্রা নিয়ে পড়েছে—রাত বারোটা অবধি চলবে এখন।"

ছেলেমেয়েদের কথা বলতে সতীর কেমন যেন গালের মাংসে একটা খুশির ভাঁজ পড়ে। স্বামীর কাছে বলতেও। মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলে আর মেয়ের দেহ থেকে পঙ্গপালের মত সন্তান বেরুতে থাকলে শুধু বাপমা-রাই তৃপ্তি পায় না। মেয়েরাও যেন নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পায় বিয়েতে, মোটা হওয়াতে আর সন্তানের জন্ম দেওয়াতে! জীবন-ব্যাপী বাঙালীর এই যৌনতার তাণ্ডব! সতীর খুশি-খুশি চেহারায় সত্যবান বিরক্ত হয়ে ওঠে। কেমন একটা ঘৃণাই হয় ওর উপর।

"তুমি আরো বসবে নাকি এখানে?" সতী চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল সত্যবানের দিকে।

সত্যবান দেখল একটা বিরাট জন্তুর কদাকার ছায়া যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা বরফের হাওয়া বয়ে গেল তার শরীরের সমস্ত রক্তের উপর দিয়ে। একেই হয়ত ভয় বলে, ঘৃণা থেকে যার জন্ম। রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে ছোটবেলাকার সাপ দেখার মত ভয়। চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারে না—সামান্য নড়ে বসবারও তার ক্ষমতা নেই যেন।

সত্যবানের মনে হয় বাড়িটাও এই ভয়েই চুপ করে গেছে। রান্না সেরে ঠাকুর মোড়ের পানওয়ালার দোকান গুলজার করছে—রকে পড়ে ঘুমুচ্ছে সীতারাম। খুকীও হয়ত এতক্ষণ ঘুমে। খোকা নিঃশব্দে একষ্ট্রায় মগ্ন।

সতী সত্যবানের কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল—গা ঘেঁষেই বলা যায়। কাপড়ের ব্যবধানেও পিণ্ড মাংসের উত্তাপ পাওয়া যায়। তবু সাপের ঠাণ্ডা স্পর্শে যেন কিলবিল করে ওঠে সত্যবানের স্নায়ুগুলো। মোটা মোটা আঙুলগুলো সত্যবানের চুলে চালিয়ে দেয় সতী। টেবিলে কাৎ হয়ে হেলান দিয়ে মাথাটা নুইয়ে আনে। সত্যবানের নিশ্বাস নেবার হাওয়ায় সতীর চুলের একটা ফিকে সুগন্ধ এসে মিশল। গা বমি-বমি করে উঠল তার, যেন সে নাকে অ্যালকোহল টেনে নিচ্ছে। বুঝতে পারল সত্যবান তার গালে, চিবুকে, চোখের কোলে একটা নরম মাংসের স্তূপ ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে—সে-মাংসের উপরকার শিরাগুলো দপদপ করছে রক্ত-কোষের চঞ্চলতায়।

সত্যবানের ভয় আর ঘৃণায় মনস্তত্ত্বের এমন কোনো রাসায়নিক উপাদান এসে জুটল না যাতে সে সামান্য উন্মাদনা অনুভব করে। জড়, অসার যেন অশুচি হয়েই রইল সে সতীর উত্তাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

দুই
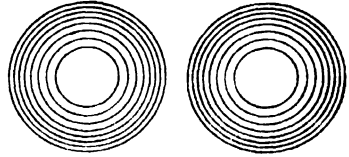
সত্যবান লক্ষ্য করছিল, সতী কেবল আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজছে। পারিবারিক ভীড়ে এ সুযোগ দুর্লভ। বন্ধুর ছেলেকে সতীর বাবা যত প্রশ্রয়ই দিন না—মার চোখের ভুলচুক ছিল না। আর প্রশ্রয় মানেও বা কি ? সত্যবানকে পেলে খানিকক্ষণ বসে গল্প করা—অর্থনীতির সূত্র ধরে নিরর্থক একটু আলোচনা করা। চাকরী করতেন বলেই তাঁর ব্যবসার দিকে ছিল ঝোঁক—অর্থনীতির আলোচনাটা সে-ঝোঁকেরই কণ্ডূয়ন।

পারিবারিক পাহারায় কি তুমি করতে পার ? দুজন দুজনের দিকে চেয়ে বসে থাকতে পার কতক্ষণ—পার কুশল জিজ্ঞাসা করতে। কিম্বা পাঠ্য বই আর শাড়ীর সৌন্দর্য নিয়ে দু-এক টুকরো নিষ্পাপ কথা হতে পারে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে যেমন জল, ধৈর্যে আর সাহসে নাকি প্রেম। সত্যবান দু বছর একটানা ধৈর্যই মক্স করছে, সাহস দেখাতে সাহসী হচ্ছে না। মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হয় সাহসের অভাবেই না একদিন সে সতীর জীবন থেকে মুছে যায়। কিন্তু সতী অনেক সময়েই দুঃসাহসী। একজনের সাহসের অভাবকে দুঃসাহস দিয়ে পূরণ করতে চায়।

মিস্টার সেন আফিস-ফের্তা, হয়ত কোট-প্যাণ্টালুন ছাড়তে গেছেন, এখুনি এসে জুটবেন। সেই অবসরে—আর সত্যি সেটা

সুবর্ণ-সুযোগ, কেন না মা-ও তখন খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত—সতী দৌড়ে এসে সত্যবানের একটা হাত তুলে নেয় প্রায় ঠোঁটের কাছে, তারপরই হাতটা ছেড়ে হাসতে থাকে দাঁড়িয়ে। মাংসের গোলাপী, নরম, সজীব আভায় সতীর ঠোঁটগুলো সত্যবানের চোখে অপূর্ব মনে হয়। কি যে সে করবে কিছুই তার মাথায় আসে না—সতীর হাসির অনুকরণ করে একটু হাসতে চায়।

সেটির একটা কুশনে সতী বসে পড়ল—হাল্কা শরীরটা ছুঁইয়ে রাখল যেন।

"দুদিন আসা হয় নি! কত যেন কাজ।" নীচের ঠোঁটে উপরের ঠোঁটটাকে সতী চেপে ধরল।

"রোজ রোজ এলে ম্যাট্রিকে তোমার ফোর্থ ডিভিসন জুটবে।" ততক্ষণে সত্যবান নিজেকে গুছিয়ে সহজ করে এনেছে।

"জুটুক—"ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড়টা একটু দুলিয়ে দিলে সতী।

"তারপর ?"

"তারপর আবার কি ? আসছে বছর পরীক্ষা দোব আবার—"

"আমি এলেও বই থেকে মুখ তুলবে না ত!"

"বাঃ—মনে করছ খুব একটা কথা বললে—"

কথার এক একটা পাষাণ চড়িয়ে সত্যবান সতীর মনটা ওজন করে নেয়। বিরুদ্ধ কথার তারেও যখন কাঁটা বিগড়ে যায় না তখনকার তৃপ্তি অসামান্য। সে-তৃপ্তি পাবার লোভ সতীকে দেখলেই সত্যবানের পেয়ে বসে। একে নার্সিসাস-বৃত্তিও বলতে পার। যখন মেয়ে আর পুরুষ অসমান ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে তখন পুরুষের প্রেম আত্ম-প্রেম ছাড়া আর কি ? চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায় করবার জন্য ভালবাসাকে দাদন দেওয়া। মেয়ের তরফ থেকে ব্যাপারটা হয়ত তা নয়। পুরুষের বিধানে পাবার লোভ তার করতে নেই, তাকে

শুধু দিতেই হয়। মা-বাপ জুটিয়ে আনবে যে স্বামী তাকেও যখন ভালবাসতে হয় তখন কোথায় থাকে আত্মপ্রেমের স্বার্থপর অনুভূতি ?

সতী তেমন মেয়ে নয়, অন্তত শতকরা নিরানব্বুই-এর দলে নয়, তারি জন্য অবিশ্যি তাকে ভাল লেগেছিল সত্যবানের। প্রেমে পড়বার যে ওর সাহস আছে, প্রেম করবার যে স্বকীয় ইচ্ছা আছে, ততটুকু বৈশিষ্টেই সত্যবান আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ যেন কোনো ঝর্ণা থেকে জল খাওয়ার আনন্দ—কুজো থেকে কাঁচের গ্লাসে বাধ্যতামূলক জল খাওয়া নয়। এখানেও মুক্তির চেহারাটাই সত্যবান পছন্দ করেছে। তাকে ষোল আনা আনন্দ-উপভোগের সুযোগ দিয়ে সতী যদি নিজের জন্যও খানিকটা সুযোগ করে নিতে পারে ত নিক। অত্যাচারী স্বামীর মত তাতে ঈর্ষা করার দুর্বুদ্ধি সত্যবানের নেই।

চটির আওয়াজ শোনা গেল—মিস্টার সেন আসছেন।

তাড়াতাড়ি গলার আওয়াজ শ্রুতিগোচর করে সত্যবান বললে—"অ্যাডিশন্যালে মেকানিক্স নিতে গেলে কেন? যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে দেবভাষাটাতেই সরস্বতীর পক্ষপাত বেশি—নম্বর জোটে ভাল।" সত্যবান সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করতে চাইল।

"মেকানিক্স্ ভাল—আমার বেশ ভাল লাগে।" ছাত্রীর মত সশ্রদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে সতী কথাগুলো।

"তারপর জুনিয়ার মুখার্জি," আসর জমানার উৎসাহ নিয়ে মিস্টার সেন ঘরে ঢুকলেন: "খবর কি বল! রাখো তোমার পড়ার কচকচি।" একটা কুশনে এসে জাঁকিয়ে বসলেন মিস্টার সেন। সত্যবানের প্রতি বাবার আগ্রহে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সতী।

"খবর বলুন"—চুপসে এতটুকু হয়ে সত্যবান শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলে।

"মেকানিক্‌স্‌-এর কথা বলছিলে ত—সায়ান্স অব মেকিং মেসিন্‌স্‌ —ইকনমিক্স পড় আর পলিটিক্সের সপিণ্ডকরণই: কর—তাতে 'কিছুই হবে না—মেসিনের দরদ বোঝা চাই। অসভ্যের মত মেসিনের প্রতি একটা ভয় আর বিতৃষ্ণা নিয়ে থাকলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 'বন্দেমাতরম্‌' চেঁচানিতেই শেষ হবে।"

"কিন্তু গান্ধীজী ত বলছেন চরকাতেই স্বাধীনতা আসবে—"

"বৃহৎ বাতচিন্তামণি বড়ি খেয়েই অ্যাপোপ্ল্যাক্সি সারবে! আর কি চিন্তা! গান্ধীও বলেছেন আর আমরাও খেয়ে না খেয়ে চরকায় তেল দিতে শুরু করেছি। চরকার ইকনমিক্সটা আমায় বোঝাতে পার?"

"ধরুন আমরা যদি নিজেদের কাপড়টা নিজেরা তৈরী করে নিতে পারি তাহলে ত ল্যাঙ্কাসায়ার কাৎ!"

"তা যদি হয় ল্যাঙ্কাসায়ার কেন অনেক সায়ারই চোখের জলে সায়র হয়ে উঠবে! কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, তা কি আমরা পারি—চরকা দিয়ে? মানি, চাষীরা ছ'মাস বসে থাকে—তাও বাংলাদেশে নয়—সে সময়টা চরকা কেটে নিজেদের কাপড় গামছাটা তৈরী করে নিতে পারে—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, খরচ বাঁচে কাজেই আয় বাড়ে। কিন্তু রেলিব্রাদার্সের সরু কাপড় পরে এই গরমের দেশে ওরাও ত অভ্যাসদুরস্ত হয়ে গেছে—খদ্দর যদি ওদের গায়ে বেঁধে তবে ত দোষ দেওয়া যায় না! তুমি কলকাতায় আছ তোমায় যদি বলি বনে গিয়ে থাক—রামচন্দ্র হলেও তুমি তা পারবে না।"

অখণ্ড মনোযোগে সত্যবান আর সতী কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। উৎসাহে আরো মুখর হয়ে উঠলেন মিস্টার সেন।

"ম্যাঞ্চেস্টার আর ল্যাঙ্কাসায়ার চরকায় কাৎ হবে না, হতে পারে না। ভারতবর্ষের কাপড়ের কলই তাদের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী।

মেসিনের সঙ্গে হাত সময়ের দৌড়ে হেরে যেতে বাধ্য আর তা থেকেই হাতের শিল্পের সবদিক দিয়ে হয় পরাজয়—গুড কয়েন যেমন বেড কয়েনকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়, যন্ত্রশিল্পও ঠিক তেম্নি উচ্ছেদ করেছে হস্তশিল্পের। যন্ত্রকে ঠুকতে হয় যন্ত্র দিয়ে। ট্যাঙ্ক আর মেসিনগানকে তুমি হাতিয়ার দিয়ে হটাতে পার না—সে চেষ্টায় উপকার হয় না, হয় আত্মক্ষয়।" সিগারটা ধরিয়ে নিলেন মিস্টার সেন। সত্যবানকে এক পলক চেয়ে দেখল সতী। তার মগজের স্নায়ুগুলো শিকড়ের মত রস আহরণ করে চলছে, পাতার সজীবতা তার চোখে।

"সভ্যতা মানে ত প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষের সুবিধে করে নেওয়া। যন্ত্র তাই সভ্যতার জুড়ি। যন্ত্রের উন্নতি করে মানুষ তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঢের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে—দেশনেতা হোক আর ঈশ্বরই হোক কারু আদেশে মানুষ আর চুপসে যেতে পারে না—সভ্যতার রীতিই নয় থেমে গিয়ে তা পেছনে চলতে শুরু করবে। এমন নয় যে সভ্যতার মোহে আমরা স্বাধীনতাকে পেছনে ফেলে এসেছি আর তাই চরকা হাতে দু'কদম পেছনে হটলেই তাকে আবার পাওয়া যাবে। প্রচুর সভ্য ছিলাম না বলে স্বাধীনতাকে আমরা হারিয়েছি—সভ্যতাকে অর্জন করতে পারলে স্বাধীনতা আপসে এসে যাবে। সভ্যতা মানে তপোবন সভ্যতা নয়—মানুষের মগজের পালিশ-লাগা তার ঝকঝকে রূপ, মানে যন্ত্রসভ্যতা।"

মা এসে দরজায় উঁকি দিয়ে ডাকলেন : "সতী—"

চমকে উঠে শব্দটার অনুসরণ করলে তিনজনেরই চোখ। সতী দাঁড়িয়ে গেল। সত্যবান জানালা দিয়ে দূরের একটা নারকেল গাছের দিকে চেয়ে রইল। মিস্টার সেন সিগারটা দাঁতে চেপে বেদম টানতে লাগলেন।

"শুনে যা—" বিরক্তিটা গোপন করবার সৌজন্যও মার গলায় ছিল না।

সতী দাঁড়িয়ে রইল না সত্যি, চলেই গেল। কিন্তু তার যাওয়ার ভঙ্গীতে বিদ্রোহের সুর সুস্পষ্ট। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল সত্যবান। তখনকার জন্য সতীকে আরো একটু বেশি ভালবাসতে ইচ্ছা করল তার। ভারতবর্ষের কুমারীদের মত মানসিক আবেগকে দমন করবার চেষ্টা সতীর নেই। ঠাকুরদেবতার প্রতি অহেতুক ভক্তি দেখিয়ে হিষ্টিরিয়ায়ও তাকে ভুগতে হবে না।

দুজনের জন্যই চা এলো আর কিছু লুচি আর আলুভাজা। মিস্টার সেন লাফিয়ে উঠলেন—যেন এতক্ষণ মাত্র এরই অপেক্ষায় বসে ছিলেন। স্ত্রীর অদ্ভুত আচরণে মনটা যে তার অন্ধকারে অসার হয়ে উঠছিল এতক্ষণে সে গ্লানি তাড়াবার একটা উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।

"হাতের তৈরী হলেও লুচিতে আমার আপত্তি নেই—চটপট কর সতু—সত্বর না হও ত দেখবে ওরা সব আমার পেটেই গ্লুকোজ তৈরী করতে চলে গেছে—" মাত্রারও একটু বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে চাইলেন মিস্টার সেন।

অনিচ্ছুক হাতে একটুকরো লুচি ভেঙ্গে তার সঙ্গে দু-এক কুচি আলু মুখে পুরে দিল সত্যবান। ওগুলো চিবুতে লাগল না হাসতে লাগল ঠিক বোঝা গেল না।

খাবার তৈরী করতেই কি সতীর দরকার হয়েছিল?—আবিষ্কারের ঔৎসুক্যে সত্যবানের মন যেন খনির অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে: হতেও পারে। মিস্টার সেনের স্ত্রী হিসেবে মিসেস সেনকে তেমন নির্দোষ মনে করা হয়ত অস্বাভাবিক নয়। অন্তত সত্যবানের সঙ্গে ব্যবহারে মিসেস সেন যে স্নেহের পরিচয় দিয়ে থাকেন তারপর তাঁর উদারতাকে

কিছুতেই সন্দেহ করা যায় না। ভেবে নেওয়া উচিত যে পোশাক পরিচ্ছদের মত মনটা তার পরিষ্কার, সাদাসিধে। কিন্তু সতী সম্বন্ধে কি তিনি ততটা পরিষ্কার? হয়ত সে হিসেবে তাঁকে মিস্টার সেনের সহধর্মিণী বলা যায় না। অল্প বয়সেই হয়ত তাঁর বিয়ে হয়েছিল—অন্তত তেমন দিনে, যখন মেয়েদের জ্ঞান হওয়া মাত্রই শুনতে হত শিবের মত স্বামী তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই স্বামী দেবতাটি যখন সত্যি সত্যি একদিন এসে জুটত তখন তারা ক্রমেই আবিষ্কার করতে থাকত যে তার সঙ্গে তাদের যৌনসম্বন্ধটাই উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের জীবনকে তাই যৌনতার ঊর্ধ্বে তুলে দেখবার আর তাদের সুযোগ কোথায়? সতী সম্বন্ধে মিসেস সেন তাই সাবধানী। সতী সম্বন্ধে সত্যবান তাই তাঁর চোখে সন্দেহভাজন। কয়েক মাস যাবৎ সত্যবান তা একটু একটু লক্ষ্য করছে। একটু আগেও তার মুখে সেই সন্দেহের ছায়াই সত্যবান চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছিল।

এক চুমুকেই চা শেষ করে আবার সিগারটা ধরিয়ে নিলেন মিস্টার সেন। সত্যবান তখনও একটু একটু চা টেনে নিয়ে কাপের কানায় ঠোঁট ঘসছিল।

ভাঙ্গা প্রসঙ্গটাকে জুড়তে চেষ্টা করলেন মিস্টার সেন: "আমার কি মনে হয় জানো, জুনিয়ার? আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রথম সোপান হওয়া উচিত মেসিন-ইণ্ডাষ্ট্রি। তাকে বর্জন করে তোমাদের গান্ধীজী যে পথ ধরেছেন তাতে ঈশ্বর-প্রাপ্তি হতে পারে স্বাধীনতা নৈব নৈব চ।"

কিন্তু বক্তৃতা আর এগুল না। চাকর এসে খবর দিলে মাইজীর তবিয়ৎ আচ্ছা নেই, বাবুজীকো বোলায়েছেন। মিস্টার সেন চটিতে পা গলিয়ে খানিকক্ষণ বোকার মতই চেয়ে রইলেন। যেন মিসেস

সেনের অনর্থক এ-সময়ে শরীর খারাপ হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। যেন শরীর খারাপ করে মিস্টার সেনের কথার মৌতাতটা নষ্ট করবার কোনো অধিকারই তাঁর ছিল না। তবু মিস্টার সেনকে যেতেই হবে। চোখের মটকানিতে সত্যবানকে বসতে বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

সতীর মা সত্যবানকে নিয়ে খুব খুশি নন—সতীর বাবাকে তাই খুশি রাখতে সত্যবানের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। মিস্টার সেনের উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠলেও বিরক্তিকে তার হাসির মুখোসই্ পরিয়ে রাখতে হয়। বিরক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে গেল সত্যবান। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে নিলে। দু'পা পায়চারি করে দেয়ালের একটা দিল্লীর দরবারের ছবির দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

পেছন থেকে পিঠে একটা ছোট নরম কীল খেয়ে ফিরে দাঁড়াল সত্যবান। সতী নিঃশব্দে হি-হি করে হাসছিল।

"মা ?" একটু আশঙ্কা নিয়েই সত্যবান মিসেস সেনের স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা করল।

"কিছু নয়। তোমায় আমায় এক সঙ্গে দেখলে ওম্নি অস্থির হয়ে ওঠেন।"

সতীর ঠোঁটে লাগা হাসি সত্যবান নিজের ঠোঁটেও একটু ছুঁইয়ে নিলে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে খানিকক্ষণ হাসতে লাগল।

"আমি পালাই। এক্ষুণি রোগ ভালো হয়ে যেতে পারে।" পালাবার সময়ও সতী ঘাড় ফিরিয়ে মিষ্টি চোখ দুটো সত্যবানের মুখে, চোখে, সমস্ত শরীরে বুলিয়ে নিয়ে গেল।

ফুটপাথ ধরে সত্যবান যখন চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ যেন মনে হল তার মিস্টার সেন তাকে বসতে বলেছিলেন। ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু মিস্টার সেনের পলিটিক্সের লম্বা বক্তৃতার পর সতীর

হাসিগুলোকে কি সে আর মনে রাখতে পারবে? হস্টেলের দিকে আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে সত্যবান। অন্যায় হল। মিস্টার সেন ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। কিন্তু সতীর হাসিগুলোকেও ত ভোলা যায় না। একটা মহামূল্য সম্পদ চুরি করার পর বিবেকবান চোরের মত সে তর্ক করে চলল।

হস্টেলের গেটে এসে ভাবল সত্যবান শরীরে তার সতীর ছোঁয়া-টা কি করে বাঁচানো যায়। পবিত্রতা নষ্ট হবার ভয়ে সন্তর্পনে সে গেট পার হল।

তিন
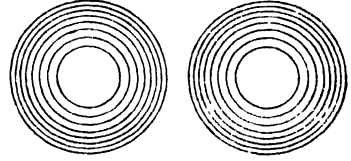
"তোমার মা রাজী হবেন না কিছুতেই।"

"মা রাজী হবেন? পাঁচটা বছর এ দুশ্চিন্তায়ই শরীর নষ্ট করে ফেললেন—"

"বাবা?"

"কিছু বলবেন না। তিনি জানেন এ আমার নেহাৎ পার্সোনাল ব্যাপার।"

"আর তুমি?" সত্যবান দুষ্টু ছেলের মত তৈরী করে আনলে হাসিটা।

"আমি ত কিছুতেই রাজী নই! আমার জাত আছে, সমাজ আছে—তাদের কথা ত ভাবতে হয়!" সতীও খিলখিল করে হেসে উঠল।

সতীর এই সাংঘাতিক হাসিই অনেকটা দিনকে দিন সত্যবানকে তার ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের দিকে টেনে আনছিল। দিনের পর দিন সত্যবান যেন আর্সেনিক খেয়ে যাচ্ছে। এ-ধরণের হাসি ভৈরবী রাগিনীর মত শুধু খোলাখুলি কোমল পর্দায়ই বাঁধা নয়—পর্দাগুলোর আড়ালে রয়ে গেছে অসংখ্য শ্রুতি—সত্যবানের কানে একে একে তারা ধরা দেয়। তাতে সে সতীর স্বচ্ছ, ঝরঝরে মনের চেহারা দেখতে পায়। রৌদ্রে ঝলমল করছে একটা শাণিত তলোয়ার যেন।

চারদিকের ম্লান, নিস্তেজ মেয়ের ভিড়ে সতী এত উদ্ধত আর নিঃসঙ্গ যে সত্যি চমক লাগায়। সত্যবানের মনে মেয়েদের সম্বন্ধে একটা নূতন অনুভূতির জন্ম দিয়েছে সতী। সে-অনুভূতিরই মোহ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের গঙ্গা—তার ওপারে আবছা কলকাতা। ঘাসের বিছানায় সতীর গা ছুঁয়ে একটু নিবিড় হয়ে বসল সত্যবান।

"সমাজকে দূরে ফেলে আসা—তারও একটা দুর্দান্ত থ্রিল আছে। এখানে তুমি আর আমি একা—দূরে ওই কলকাতা—বেশ ভালো লাগছে না?"

আনন্দের একটা উচ্ছ্বাস দুই ঠোঁটে চেপে নিয়ে চুপ করে রইল সতী খানিকক্ষণ: "তোমার থিসিস দে'য়া হয়ে গেছে?" উচ্ছ্বাসটা সংযত রূপ নিলে। সতী মনে মনে ভবিষ্যৎ রচনা করে চলেছে।

"হুঁ"। সত্যবানও কথার দিকটা সংক্ষেপ করে আনলে!

সত্যি চুপচাপ বসে থাকতেই ভালো লাগে। কথা বলা ত এম্নি একটা আবহাওয়া পাবার জন্যই। কথা বলে বলে একটি মেয়ের মনকে তুমি তৈরী করে নাও, দুজনে এম্নি একটু নিশ্চিন্ত নিঃসঙ্গতা পাবে বলে। প্রেম মানে কি? কোনো মেয়ের সঙ্গে একান্ত নিঃসঙ্গতা উপভোগ। আছে গঙ্গা, একফালি সভ্যতাদুরস্ত বন, আর একটি মেয়ে তোমার গা ঘেঁষে। তারপরও কথা বলার কিছু থাকে? একটু কানপাতলেই তুমি শুনতে পার সতীর হৃদপিণ্ডের ধুক্‌ধুক্ শব্দ। সে শব্দে একটা ক্ষুদ্র সরীসৃপ যেন তোমার মেরুদণ্ডের গিঁঠগুলো বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। চামড়ার নীচে অসংখ্য জীবাণুর চলা-ফেরা অনুভব কর। প্রেম তোমাকে তার চেয়ে বেশি আর কি দিতে পারে?

"কবে?" সতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে।

"আজ!"

"আজ?" সত্যবানের কথায় একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি হল যেন।

"কেন? পারো না?"

সতী সত্যবানের চোখের দিকে চেয়ে রইল, যেন তার স্বচ্ছতায় ওর মনের ছবি দেখতে চায়। তারপর তার ঠোঁট থেকে আলগা ভাবে বেরিয়ে আসে : "পারি।"

"কোথাও কোনো সঙ্কোচ থাকবে না বল!"

সতী আবার চাইল সত্যবানের মুখে। বাসি ফুলের মত ম্লান একটু ব্যথাই বুঝি তার ঠোঁটে লেগে ছিল। সত্যবান নিজেই তাতে ব্যথিত হল।

"সঙ্কোচের কথা বারবার কেন তুমি জিজ্ঞাসা কর?"

"কোনো কারণে অপরাধী হবার ভয়ে!"

"অপরাধ করতে ভয় পাও?"

"নিজের মনের কাছে অপরাধ করলে ভয় আছে।"

"এ ছ'বছরের ইতিহাসে নিজের মনের কাছে ত তুমি অপরাধ কর নি—আমার মনের কাছেও নয়।"

এ ছ'বছরের ইতিহাস একটা সদ্য-মুখস্ত কবিতার মত মনে পড়ে সত্যবানের। সতীকে সে দেখেছে, একটা প্রজাপতি ধীরে ধীরে যেন গুটির বন্ধন কেটে বেরিয়ে এল। মনের আকাশ-পিপাসাই তার পাখার রং-এ উজ্জ্বল। এ রং যখন অস্পষ্ট ছিল একটি সেকেণ্ড-ক্লাসে-পড়া মেয়ের অদ্ভুত মনে, তখন থেকে সত্যবান একে আবিষ্কার করে চলেছে। আজ এর স্পষ্টতায় অবাক হলে, সঙ্কোচ আনলে সত্যবান সত্যিকারের জাতিচ্যুত হবে! সতীর মনের কয়েকটি কুয়াশাচ্ছন্ন বিদ্যুতাণু যেন অ্যাটমের পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে—আজকের চোখের উদ্ভাস তার সেই বৈদ্যুতিক ঘটনারই প্রমাণ—

'কস্‌মিক্ রে'। আবিষ্কারকের তাতে অসহ্য আনন্দ হবার কথা। সত্যবান আরেকটু নিবিড় হয়ে বসল, চাইল দু'দেহে তাদের যেন আর ব্যবধান না থাকে—যেন দুজনে তারা এক—অর্দ্ধনারীশ্বর—নীল আর হলুদের সমাপ্তি গাঢ় উজ্জ্বল সবুজে।

"ভালো লাগে—" সতী যেন স্বপ্নে কথা বলছে।

"কি ?"

"এম্নি বসে থাকতে, অনেকক্ষণ, সমস্ত জীবন।"

পালের নৌকো মুছে যায়, মুছে যায় নদী, পাখীর শব্দ, গাছের শিরশির। সতী আর সত্যবানের স্থূল উপস্থিতি যে স্থানের জন্ম দিয়েছিল তাও যেন আর নেই, নেই তাদের সে-উপস্থিতিও। জগত যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে কয়েকটি জ্যামিতিক রেখায়—তার আগে, এখন পর্যন্ত, একটা মৃদু, মূর্চ্ছাহত চেতনামাত্র আছে সত্যবানের, সতীর উপস্থিতির চেতনা—ক্ষীণ ব্যথার মত সুন্দর তার অনুভব। কিন্তু তাও পালিয়ে যাচ্ছে, খুব দ্রুত—তারপর সে-ও আর নেই—শুধু জ্যামিতিক রেখা।

"আমাদের বিয়েতে" সতী একটা ঢেউ-এর দিকে চোখ চালিয়ে নিয়ে বলল : "কারো মত নেই, না ?"

সতীর কথার আওয়াজটা সত্যবানের কানে এলো : আবার যেন জগত তৈরী হচ্ছে : ইলেক্ট্রনের সঙ্গে প্রোটন এসে মিশছে—এ যেন তারি শব্দ। চেতনায় জন্ম নিলে আবার সত্যবান।

সত্যবানকে চুপ থাকতে দেখে সতী হয়ত একটু উদ্বিগ্নই হল। চোখ তুলে আনল তার মুখের উপর।

একটু তাড়াতাড়িই বলতে চেষ্টা করলে সত্যবান : "মত ? কেউ মত দেবে না।"

"তাই আমার আরো ভালো লাগে।"

"তোমার ভালো লাগে বলেই তোমাকে আমার ভালো লাগে।"

"বিয়ে ত বিচ্ছিন্ন হওয়া,পুরানো থেকে নতুনের দিকে অ্যাড্‌ভেঞ্চার—বাবা মা আমাকে ত তেমন বিচ্ছিন্ন একদিন করে দিতেনই—না হয় আমি নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে এলুম। পরিপূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন—তারপর তাদের সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ থাকবে না।"

"বিয়ে মানে নিজেকে আবিষ্কার করা—আবিষ্কৃত হতে দেওয়া নয়। যাকে তুমি বিয়ে করবে সে তোমার ড্রেসিংটেবিলের আয়নার মত, তার হাতে তুমি উপঢৌকন নও। এ যেন দুটো আয়না মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, আয়নার অনন্ত প্রতিচ্ছবি নিয়ে—তবু কি বুকের রহস্যের শেষ আছে, এত ছবি নিয়েও নিজেকে আবিষ্কার করা শেষ হয় না!"

"লাখলাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

"তাই।"

কথা বলে যেন সত্যবান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কথা বলার মন ছিল না তার। চুপ করে থাকতেই ভালো লাগছিল। সমস্ত শরীরটা তার চুপ করে গেছে। এত চুপ যে সময়ের চলার শব্দও সে অনুভব করতে পারে।

সূর্য নেই। বিকেলের আভা শুধু। এই ঠাণ্ডা আভায় অনেক কবিতা মনে পড়ে। সতী গুণগুণ করল খানিকক্ষণ বিদ্যাপতি। গানের একটা ভ্রমর মগজে তার গুণগুণ করছে। মনের আবেগ খুঁজতে লাগল সতী রবিঠাকুরে।

চোখে একরাশ ঠাণ্ডা নিয়ে সত্যবান সতীর মুখের দিকে চাইল। এত ভালো লাগছে আজ ওর মুখ—এত মিষ্টি! তার সমস্ত দেহের ইচ্ছা হচ্ছিল যে সতীর দেহের উচ্ছলতাটুকু শুষে নেয়। কিন্তু ইচ্ছার স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন রূপটাকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। বলবার মত

কোনো কথা খুঁজে না পাওয়াতেই তার চুপ করে থাকা। ক্রমে এই চুপ করে থাকাই হয়ে উঠল রোমান্টিক।

"আর এক মাস পরেই বি-এর রেজাল্ট বেরুচ্ছে—" গুণগুণানি থামিয়ে এনে সতী বললে।

"তারপরই আমাদের বিয়ে।" রোমান্টিক আবহাওয়ায় ছেদ ফেললে সত্যবান। নিশ্বাসের সঙ্গে ছোট ছোট হাসির টুকরো ছড়িয়ে খুশিতে ঝিলমিল করে উঠল সতী। ওর শরীরের নরম উত্তাপ সত্যবানের শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে—উত্তাপের স্রোত পা থেকে উঠে এল বুকে, তারপর ঠোঁটে, কানে, তার ঠাণ্ডা চোখেও। দেহকে সে হাওয়ায় মিশিয়ে দিয়েছিল, তাতে ফিরে এল রক্ত আর মাংস। রক্তের চাপে তার হৃৎপিণ্ড যেন ছিঁড়ে যেতে চায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাঁচবার জন্যই যেন সে সতীকে জড়িয়ে ধরল, মুখ লুকোতে চাইল তার মুখে। শুকনো ঠোঁট অন্ধের মত খুঁজতে লাগল তৃষ্ণার জল—আশ্রয় নিলে সতীর ঠোঁটে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের উপর আরেকটা সন্ধ্যা নেমে এল সত্যবানের। গঙ্গার অন্ধকার স্রোতে গলে পড়তে লাগল দূরের সহর, গাছের সার, ধোঁয়াটে আকাশ। বিশ্বের দ্রবতায় মিশল গিয়ে যেন তাদের দুজনেরও শরীর। গলে যেতে দিল নিজেকে সত্যবান।

পাখীর কাকলির মত আওয়াজ! দূর থেকে কাছের বাতাসে ঘনিয়ে এল। হঠাৎ চমকে উঠল দুজনেই। ফিরে আসতে হবে এখন বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সতীর সঙ্গে ব্যবধান বাঁচিয়ে সত্যবান সরে গেল খানিকটা। তিনটে ছায়া দেখা যাচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ ছাড়াও একটি খুকী। ওরা এগিয়ে আসছিল।

"চলো ফিরতে হবে ত!" সত্যবান উঠে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দিল সতীর দিকে।

"আরে, সতু ?"

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সত্যবান : "রজত !"

"তুই আসবি, বলিসনি ত আগে—"

"যেন তুই বলেছিলি—"

মেয়েটি খুকী নিয়ে একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে সম্বোধন করলে রজত : "মিসেস রায়, এই আমার বন্ধু সত্যবান—উপাধি বিদ্যাদিগ্‌গজ। আর সত্যবান ইনি মিসেস রায় আমার পরিচিত মানে বন্ধুও বলতে পার—"

মিসেস রায় রজতের কথাটা কেটে দিলে : "বরং বলো, ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এণ্ড গাইড।" মিসেস রায়ের ঝরঝরে গলাকেই যেন নমস্কার জানালে সত্যবান : "সতী, রজতকে ত আমার অনেক প্রসঙ্গের মারফৎ চেনোই—মিসেস রায়, সতী আমার, মানে আমার সঙ্গে—"

"থাক, বুঝেছি।" হাসিতে ঠোঁটের ধারগুলো বাঁকিয়ে দিলেন মিসেস রায় : "এখনকার সম্বন্ধটা বোঝাতে পারে বাংলা ভাষায় তেমন শব্দ নেই।"

বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতি করলে রজত : "কেন—বাগ্‌দত্তা—"

"সিলি।" নিঃশব্দে হেসে উঠলেন মিসেস রায় : "বাগদত্তার বাক দানের মালিক বাপ-মা। আপনাদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই বাপ-মার হাত নেই সত্যবানবাবু—"

মুখে একটু হাসি নিয়ে সত্যবান সতীর দিকে চাইলে। সতী কাউকে বিব্রত না করে চটপট উত্তর দিলে : "আপনি দুঃসাহসিক অনুমান করেছেন—"

"রজতের চেয়ে যখন আমি বয়সে পাঁচ বছরের বড় তোমার চেয়ে

কম পক্ষে আট থেকে দশ বছরের বড় আমি হব আর আমার এ-অনুমান নিশ্চয়ই দুঃসাহসিক নয়—কাজেই তোমাকে তুমিই বলছি সতী, রাগ করবে না ত ?"

"রাগ করবার মত অপরাধ ত আপনি করছেন না—"

"তা অনেক করেছি—প্রথম দিনের আলাপেই তার ফিরিস্তি শুনে লাভ নেই। যা বলছিলাম—তোমাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, সুখী হও।"

বিয়ের পর এ-যেন আশীর্বাদ পাওয়া! খুশিতে সতী দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। একটু এগিয়ে গিয়ে খুকীকে জড়িয়ে ধরে বললে : "এর সঙ্গে ত আমার পরিচয় হল না।"

"মেয়ে।" বিষণ্ণতায় একটু অন্ধকার হয়ে এলো যেন মিসেস রায়ের মুখ।

"তোমার নামটি কি ভাই ?"

সতীর আদরে ঠিক মার মত করেই হেসে বললে খুকী : "বনানী। বনানী রায়।"

"বাঃ কি চমৎকার নাম !"

"কিন্তু নাম কীর্তন করতে থাকলে, ওপারে যাওয়া আর হবে না।"

"ভুল করলেন সত্যবানবাবু, ওপারে যাবার সম্বল ত আপনাদের জীবে দয়া আর নামে রুচি!" ঠাট্টায় আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস রায়।

"নাম-দুর্নাম রেখে দাও, আপাতত ওপারেই যাওয়া চাই" রজত বাস্তবতায় কঠিন খরখরে গলায় বললে : "আমি নৌকো ডাকছি। এক নৌকোতেই হবে, কি বলিস সতু ?"

"বেশ ত।" মিসেস্ রায়কে নিয়েই সত্যবানের চিন্তা চলছিল। মেয়েটিকে, মহিলাটিকে বলাই ভালো, ঠিক স্পষ্ট চেনা গেল না। কথা

বলতে খুব আনন্দ পায়, চট করে শুধু ওটুকুই বোঝা যায়। তারপর আর অনুমান এগোতে চায় না। রজতের সঙ্গে ওর কি করে পরিচয়? কাকার টাকায় একটা ব্যাঙ্ক তৈরীর চেষ্টা করছে রজত, লোকের সঙ্গে পরিচয় করাই ওর পেশা। হতে পারে মিস্টার রায় ডাঁশাল লোক।

ইতিমধ্যেই খুকীকে নিয়ে পায়চারি শুরু হয়ে গেছে সতীর। কিশোর বয়েস পার হয়ে গেলে সে বয়েসের প্রতি একটা কুৎসিত আকর্ষণ থাকে মেয়েদের। সম্ভবত তা নাবালকত্বের প্রতি আকর্ষণ! বিয়ের আগ পর্যন্ত নাবালক থাকা ওদের অভ্যাস-গত।

সত্যবানের দিকে এগিয়ে এল মিসেস রায়। সত্যবান উৎসুক শ্রোতার ভঙ্গীতে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়। ভদ্রতা-জ্ঞাপনটাও এ সুযোগে সেরে ফেললে: "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলুম মিসেস রায়।"

"কিন্তু মিসেস রায় ত আমার নাম নয় সত্যবানবাবু—বাপ-মার দেওয়া আমার একটা নাম আছে, সুরমা।"

"তা হলে আমারও একটা নালিশ আছে, সুরমাদি" সম্বোধনটা সুরমার মুখে চোখে কি রকম প্রতিক্রিয়া আনে তা দেখবার জন্য সত্যবান একটু চুপ করে রইল তারপর সম্মতির দু'একটা ইঙ্গিত আবিষ্কার করে নালিশ পেশ করলে: "যদিও আজকাল বাবু কথাটায় উনিশ শতকীয় কদর্থ নেই তবু আমার নাম থেকে ওটা ছেঁটে ফেলবেন —আর আমাকে তুমি বলতে আপনার সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়।"

"উচিত নয় আর আমার নেইও।"

সত্যবান সুরমাকে ভালো করে লক্ষ্য করলে। চেহারাটা এম্নি তার ততটা সুন্দর নয় উদ্ধত ভঙ্গীতে যতটা সুন্দর দেখায়। নম্র এমন কি বুদ্ধিহীনই ঠোঁটের ধরণটা কিন্তু তার চারপাশে কথা বলবার সময় চমৎকার সব ছোট ছোট রেখা জড় হয়ে ওঠে যাতে মনে হয়

মোনালিসার রহস্যময় হাসি এমন অদ্ভুত ঠোঁটেই সম্ভব। ত্রিশ বছরের উপরে বাঙালী মেয়েকে যুবতীর মত দেখায় তাও কম বিস্ময়কর নয়। কাপড় জামা জুতো কি করে দেহ-গৌরব বৃদ্ধি করে সে তথ্যও সুরমার ভালো করে জানা আছে।

সত্যবান একটু অভিভূতই হল: "আপনার সঙ্গে এই মাত্র পরিচয়, অথচ মনে হচ্ছে কত দিনেরই না পরিচয় ছিল!"

"হয়ত অনেক আগেই পরিচয় হওয়া উচিত ছিল বলেই এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু সে যাক্—যখনই হোক পরিচয় পরিচয়ই। এবং তা যেন থাকে। এখন থেকে আমার বাড়ি যেতে হবে বুঝলে?"

সতী এগিয়ে আসছিল, সুরমা তার দিকে কথাটা বাড়িয়ে দিলে: "এই সতী, বিয়ের সময়, বাপু, ফাঁকিটাকি দিও না—আগেই বলে রাখছি।"

সতী একটু লজ্জিত হয়ে হাসলে কিন্তু অবস্থাটাকে বেশিক্ষণ চলতে দিলে না: "খুকী কি সাংঘাতিক জানেন, আমার কাছে ওর সব মাষ্টারদের নিন্দা করছিল—"

"মাষ্টারদের উপর ওর ভারি রাগ—"

"রাগ করতে আমার বয়েই গেছে, ওদের কথা আমি শুনি না কি!" এক জায়গায় দাঁড়িয়েই খুকী ফ্রকটা ঘুরিয়ে একটু নেচে নিলে।

আশ্চর্য একটা জিনিস দেখাচ্ছে এম্নি উৎফুল্লতায় সতী সত্যবানের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য হল সত্যবান, খুশি হল, খুকীর ভঙ্গীটা ভীষণ ভালো লাগল তার।

মেয়েকে নিয়ে অপদস্থ হবার ভয় যখন আর নেই সুরমা ফিরে এল আগেকার প্রসঙ্গে: "বিয়ে জিনিসটার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা নেই—ক্ষমা করো সত্যবান—কিন্তু এ ধরনের বিয়েতে এখনো কৌতূহল হয়।"

সত্যবান চূড়ান্ত অবাক হল, মানে, বিরক্ত হল। বিবাহিত বিয়েকে এমন সরাসরি অস্বীকার করতে পারে সত্যবান এখন পর্যন্ত ততটা ভাবতে পারে না। সে মনে করে বিয়েতে দোষ আছে ততটুকু যতটুকু তাতে আছে মা-বাপের জোর-জবরদস্তি। যতটুকু আছে সমাজের অন্যায় শাসন। বিয়ের উপর এতটা আঘাতের জন্য সত্যবানের রোমান্টিক মন প্রস্তুত ছিল না। পাঁচ বছরের দুশ্চর তপস্যাকে সিদ্ধির মুখে এনে ভেঙ্গে দেওয়া সে সইবে কেন? সতীকে সে বিয়ে করবে না এমন কল্পনা তার কাছে নিছক পাগলামি। হঠাৎ সত্যবান অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সুর ভঙ্গ হয়ে কেমন যেন এলোমেলো মনে হল আবহাওয়াটা। পাছে মুখ থমথমে হয়ে ওঠে সতী তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, "রজতবাবু কোথায় গেলেন?"

"নৌকোর খোঁজে" খুকীকে নিয়ে সুরমা গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। সত্যি দেখা উচিত রজত কোথায় গেল। দু'এক পা এগুলোও সুরমা। পেছনে থেকে যাওয়া সতীর পক্ষে অন্যায় হবে। ঠিক এখনি সুরমার সঙ্গ বর্জন করলে চোখে বড় লাগে। নিঃশব্দে সে সুরমার পেছু নিলে।

প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে দেরী হল না। সত্যবান অনেকটা সুস্থ হয়ে নিল। অপ্রিয় কথা জীবনে সে অনেক শুনেছে। শুনেই তার সাজানোগুছানো স্নায়ুগুলোতে উলোটপালোট লাগে। খানিক-বাদে ফের তারা স্থির হয়ে আসে কিন্তু ঠিক আগেকার ছকে আর ফেরে না—ধাক্কাটার সঙ্গে আপোস মীমাংসা হয়ে যায় যাতে আর তার উপদ্রব সইতে না হয়। মিস্টার সেনের অনেক কথাই তার মতবাদ বা মনোভাবকে অনেক সময় প্রচণ্ড আঘাত করেছে—মনে পড়ে তার, গান্ধীজীর কঠোর সমালোচনা শুনে একদিন সে মিস্টার সেনকে বিকৃতরুচির লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি কিন্তু

গান্ধীজীর অসাফল্যে আজ সে মিস্টার সেনকে শুধু শ্রদ্ধাই করে না, তাঁর মতবাদকেও নিজের করে নিয়েছে। সত্যের চেহারা নিশ্চল নয়, এখন তা ভালো করেই সত্যবান বুঝতে পারে। মনের অক্ষবৃত্ত সত্যবানের যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রন যেন ক্রমেই স্থিরতর চক্রপথ আশ্রয় করে আলো বিকীরণ করছে। তবু ইলেক্ট্রনের মত হঠাৎ আবেগের স্রোতে এ পরিবর্তন আসে না সত্যবানের। একমাস, দু'মাস, ছ'মাস, একবছর, পাঁচবছর এমন কি দশবছর চলে যায় তার এক একটা নূতন চক্রপথ ধরে নিতে। তাহলেও আলো সে বিকীরণ করেই। দিনের পর দিন যে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাতে আর ভুল নেই। নিজের মনেই সে নিজের উজ্জ্বলতা অনুভব করে।

সুরমাকে উপেক্ষায় ভুলে থাকা যায় না। বর্জন করা যায় না। ওকে সাংঘাতিক মনে হয় আর তাই মনে হয় অসামান্য। "সুরমাদি—" চেঁচিয়েই ডেকে ওঠে সত্যবান।

একটু দূর থেকেই উত্তর আসে: "সত্যবান? এসো, নৌকো এসে গেছে।"

চার
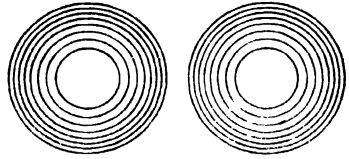
ভবানীপুরে এই ছোট একতলা বাড়িটার ভাড়াটাদের নিয়ে প্রতিবেশীরা অনেক সময় তুমুল হয়ে উঠত। শুধু দু'টি মেয়ে—বয়সে বত্রিশ আর বারো—ঠাকুর আর চাকর যে কি করে একটা বাড়ির বাসিন্দে হতে পারে এ নিয়ে তাদের আর দুর্ভাবনার সীমা ছিল না! বত্রিশ বছর বয়সের মেয়েটি ত সিঁদুর পরে না, অথচ বিধবাও নয় (বিধবা যে নয় তা বহু সাধনায় ঠাকুর চাকরের মারফৎ জানা গেছে) কিন্তু এর স্বামী কোথায়? বিদেশে চাকরি করে? কিন্তু পোস্ট-অফিসের পিয়ন ত বলে এ বাড়িতে মনিঅর্ডার আসে না। একটা মোটর অবিশ্যি এসে প্রায়ই দোরগোড়ায় থামে, একটি চৌকো, শক্ত অথচ সুন্দর মুখওয়ালা ছেলের মোটর। কিন্তু ছেলেটির বয়েস খুব বাড়িয়েও ছাব্বিশ, সাতাশের বেশি অনুমান করা যায় না। তাকে এ-মেয়েটির স্বামী মনে করা ভুল। তাছাড়া আরো দু'চার জন মাঝে মাঝে আসে, যারা এ-ছেলেটিরই সমবয়সী। কাজেই তাদের কারোর বয়সই স্বামী হবার উপযুক্ত নয়। অথচ নির্ভুলভাবে মেয়েটির একজন স্বামী আছে, কেন না জানা যায় যে দু'টি মেয়ের মা-মেয়ে সম্পর্ক। তবে সেই অদৃশ্য স্বামী-পুরুষটি কোথায়? তাকে সন্ধান করে বার করবার ব্যস্ততা অবিশ্যি কারো নেই, সে যে আছে অথচ এখানে আসে না প্রতিবেশীদের পক্ষে ততটুকু খবরই

যথেষ্ট। আর তা-ই তারা চায়। খুশিমাফিক কাহিনী রচনা করতে তাতে খুবই সুবিধে। ইতিহাসে ডার্কএজ্‌ বলে খানিকটা ফাঁকা জায়গা না থাকলে পণ্ডিতদের মস্ত অসুবিধে—পাণ্ডিত্যই মাঠে মারা যায়।

সত্যবান এসে এ-বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই রাস্তার ওধারের একটা গেঞ্জীর দোকান থেকে কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ তার উপর ঠিকরে পড়ল। মনে-ধরে-রাখা নম্বরটা দেয়ালে-আঁটা নম্বরের সঙ্গে মিলে গেছে—খুঁতখুঁত করবার কোনো কারণই সত্যবানের নেই। তবু সে কড়াগুলোর দিকে নির্ভীক হাত বাড়িয়ে দিতে পারলে না। পেছনের চোখগুলোর উপস্থিতি তাকে, অপ্রতিভ না করলেও, খানিকটা বিচলিত করে দিল। আগেও একবার এ-রকম চোখের উপদ্রব তাকে সইতে হয়েছিল—মনে পড়ে। কলেজে পড়তে একটা নাটকে অভিনয় করবার সময়। রিহার্সালে দুরস্ত করা একটা চরিত্রের ভূমিকা সে নষ্ট করে ফেললে। সুরমাদির বাড়ি ঢুকতেই এখানে যদি নিজেকে সে খানিকটা খুইয়ে যায় তবে আর তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কোন্ ভরসায়! যে চোখা কথা এ মেয়ের—পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে মনে মনে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেই সত্যবান আজ এখানে এসেছে।

চাকর দরজা খুলে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলে।

"সতেরো নম্বর বাড়ি ত এটা?" অবান্তর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল সত্যবান।

"হাঁ—"

"মিসেস রায়—মানে সুরমাদি আছেন?" পেছনের চোখগুলোকে এখনো সত্যবান ভুলতে পারে নি।

"আছেন। ডেকে দিচ্ছি—বসুন আপনি—"

চোখগুলোর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতে পারলে সত্যবান বাঁচে। ঘরে এসে ঢুকল সে যেন ষ্টেজ থেকে গ্রীন্‌রুমে এসে নিশ্বাস ফেললে।

আশ্চর্য সাজানো ঘর। সমস্ত দেয়ালে একটা মাত্র ছবি—অবনীন্দ্রনাথের 'নূরজাহান'। ঠাকুরদেবতার মত আদরে রাখা কয়েকটা বই-বোঝাই বুক-সেল্‌ফ্‌। পুরু গালিচার উপর সেটি। সেল্‌ফ্‌গুলোর বিপরীতে, জানলা ঘেঁষে ঘরের দু'ধারে দু'টো ইজি-চেয়ার—পাশে একটি করে ছোট টেবিল। টেবিল-ঢাকনি গৃহকর্ত্রীর সূচি-শিল্পজ্ঞানের বিজ্ঞাপন নয়—হোয়াইট-এ-ওয়েের বাড়ি থেকে কেনা। এতেই ঘরটার নগ্নতা সুশ্রীভাবে আচ্ছাদিত, আর এক ফোঁটা আসবার বেশি হলে মনে হত অলঙ্করণের চেষ্টা আছে।

সত্যবান ঘরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বটে কিন্তু ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল না। বইগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে একটা বুক-সেল্‌ফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র—নরেশচন্দ্র। বাঁধানো মাসিক পত্রিকা—ভারতী, সবুজপত্র, কল্লোল।

"বারে—কী ভাগ্যি—সত্যবান!" খবর পেয়েই যেন সুরমা ছুটে এসেছে।

"কথা দিয়েছিলুম আপনার সঙ্গে দেখা করব—"

"ও তাহলে এটা মাত্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা?" সত্যবান একটা সোফায় বসতেই সুরমা একটা ইজিচেয়ার দখল করে নিলে।

"যদি তাই হয় তাতেও বা ক্ষতি কি? সবার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদ ত মনে আসে না।"

সুরমার নির্বিকার ঠোঁটে কতকগুলো খুশির রেখা জমে উঠল: "রজত এলো না?"

"রজতের সঙ্গে যে আমার খুব বেশি দেখা হয় এমন নয়—"

"তা আর কি করে হবে? শুনেছি ত দিনরাত তুমি বই-তেই চোখ ডুবিয়ে থাক।"

"খুব সত্যি শোনেন নি।"

"কিন্তু তোমার চেহারা, কথা বলবার ভঙ্গী? ওতে যে বই-এর ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখে দেখে তাকে ত মিথ্যা বলা যায় না।"

সত্যি একেক সময় কিন্তু সত্যবানের নিজেরই মনে হয় যেন সে বই-এর মানুষ হয়ে উঠছে। খুব সাধারণ ভাবে, আবেগের সোজা রাস্তায় মানুষকে সে ধরতে পারে না। বিচারবুদ্ধির বন্ধুর পথে মানুষের সঙ্গে অবিরতই ঠোকাঠুকি হচ্ছে তার। সুরমার কথাগুলো শুনে মনে হল যেন সে একটা আয়নার সামনে বসে আছে—নিজের চেহারায় নিজে সে মোটেও খুশি নয়।

"কিন্তু কি পড় এত বল ত!" খানিকক্ষণ চুপ থেকে সুরমা বললে।

"এত ত কিছু পড়ি নে। কিছু কিছু পলিটিক্স আর ইকনমিক্স—"

"ভালো লাগে?"

"খারাপ লাগে না।"

"যন্ত্রযুগের তোমরা দেবতা, বাবা—অবিশ্যি দানব বললেই ঠিক হয়। যুযুৎসু দেখে আনন্দ পাওয়া আর পলিটিক্স পড়া ত সমান কথা—"

"সার্কাস দেখাও বলতে পারেন। কী অদ্ভুত কৌশলে পশু-গুলোকে খুশি মাফিক খেলোয়াড়রা চালিয়ে নিয়ে যায়, তা দেখে একটু আরাম আছে বইকি। আর সে আরাম কতগুণ, পশুর জায়গায় যদি মানুষকে ফেলা যায়!"

"মানুষের এই দামই ত তোমরা দিয়ে এসেছ—তোমরা পুরুষরা। পলিটিক্স পুরুষদের সব চেয়ে বড় কু-কীর্তি!"

"দেখা যায় আপনি নৈরাজ্যের পক্ষপাতী।"

"নৈরাজ্য তবু ভালো, মানুষ তার মনকে নিয়ে বাঁচতে পারে। মনের রং-কে তোমরা ডিগ্রী মেপে সাদা বা কালো করে রাখতে চাও কোন্ স্পর্দ্ধায়?—মেঘের রং-এর মত প্রতিমুহূর্তে যা বদলে যেতে চায়!"

এর উত্তর সত্যবানের জানা নেই, সে নিজেই এ রোগের রোগী। তবু দুর্বলভাবে একটা জবাব দিতে সে চেষ্টা করল: "মন নিয়ে বাঁচতে হলেই মনের শৃঙ্খলা প্রয়োজন। নৈরাজ্য তার ভাগ্যে অপঘাত লেখে।"

"কিন্তু সে অপঘাত আলোতে পতঙ্গের আত্মাহুতি। অসীম আনন্দেরই শেষ সীমা এ-মৃত্যু। মৃত্যুকে যখন তুমি এড়াতে পারো না, মৃত্যু আনন্দময় হোক তাই কি পরম আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত নয়?"

সুরমার দিকে চেয়ে সত্যবান দেখছিল মোনালিসার সেই অদ্ভুত ঠোঁট, যাকে হাসি বলে মনে হয়। অত্যন্ত সহজভাবে সুরমা কথাগুলো বলে যাচ্ছিল, একটি বর্ণও তার মন থেকে হাতড়ে বার করতে হয় নি। কথাগুলো যেন তার সমস্ত সত্তার ফেনায়িত উচ্ছ্বাস।

"শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলা যা খুশি তার ধুয়া টানতে পার" একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলে সুরমা: "কিন্তু কখনো কি গণ্ডী কেটে বলতে পারো—এটুকু শুধু সত্য? সত্যের সত্যিকারের রূপ-বর্ণনা আছে তোমাদের কোনো শাস্ত্রে?"

"সংস্কৃত শাস্ত্রে না থাকলেও আমাদের শাস্ত্রে আছে—সত্য মানে মানুষের কল্যাণ, সমাজগত মানুষের কল্যাণ।"

"সমাজের কতকগুলো শেখানো বুলিই ত সে কল্যাণের সংজ্ঞা নির্ণয় করছে? শিশুবিবাহ, সতীদাহ, বৈধব্য, পণপ্রথা সবই ত সে কল্যাণেরই স্ফুলিঙ্গ!"

"এদের জন্ম হয়ত হয়েছিল কল্যাণ-চিন্তার উপরই—তাই তারা সেদিনকার জন্য সত্য ছিল। শুভবুদ্ধির উপর যা প্রতিষ্ঠিত তাই সৎ—রিয়্যাল—সত্য।"

"যা রিয়্যাল তাই র‍্যাশান্যাল, যা র‍্যাশান্যাল তাই রিয়্যাল—এই মতবাদকে নিয়ে আজকের দিনেও বসে থাকবে সত্যবান? চোখের সামনে অসামান্য প্রতাপশালী জার্মান সম্রাটকে রিয়্যাল হিসেবে পেয়ে তাঁকে র‍্যাশান্যাল বলে স্বীকার না করার হেগেলের উপায় ছিল কি—যদিও সম্রাট অত্যাচারী ছিলেন? সম্রাটের অত্যাচারকেও র‍্যাশান্যাল বলে হেগেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন সম্রাটের ভয়ে, অন্য কোনো সদ্‌বিচারে নয়।" সত্যবান আর এগোতে চাইল না। নিজকে অত্যন্ত ছোট করেই বোকার মত জিজ্ঞাসা করলে: "আপনি হেগেল পরেছেন?"

"না। জানি হেগেল এ-কথা বলেছেন। মনের একটি একটি দলকে উন্মোচিত করে যদি দেখতে পারো, তোমার চোখে কোনো দার্শনিকের তত্ত্বই আর তখন রং ধরাতে পারবে না। নিজের মনের চেয়ে গভীর রং-এর হদিস তাঁরা দিতে পারবেন না।"

"মনকে, সুরমাদি, আপনি একটু বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন—" সত্যবান আরো কি বলতে যাচ্ছিল, সুরমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়ায় থমকে থেমে গেল!

'সুরমাদি'—ডাকটা ভারি সুন্দর শোনাল সত্যবানের মুখে—সুরমা তা-ই যেন মন দিয়ে শুনল। ওই একটি কথার উচ্চারণে এখানে যারা আসে তাদের দল থেকে সত্যবান পৃথক হয়ে অভিমানী ছেলের মত যেন একটু দূরে সরে রইল। তার দিকে চাইতে হলে চোখে আর তেমন দৃষ্টি থাকলে চলবে না সুরমার, হাসিতে আর রহস্য নয়, আনতে হবে স্নেহ।

আগে হলে হয়ত সুরমা বলত, "প্রাধান্য মানে?"—কিন্তু তা না বলে প্রশ্নের রুক্ষতাটা কমিয়ে আনলে: "কি প্রাধান্য দিলুম বল!"

"শারীরিক সক্রিয় ও সজীব অস্তিত্বের সাক্ষীই ত মন। মগজের গ্রে-সেল-এর উপরে তার বসতি—স্নায়ুর রকমারি তড়িৎ-প্রবাহ দিয়ে তৈরী। শরীর-ধর্ম যেমন নিয়মানুবর্তিতা মানে, মনও তাই। যেমন খুশি শৃঙ্খলার ছাঁচে তাকে তৈরী করে নেওয়া যায়। মন শরীর থেকে আলাদা একটা দুর্বোধ্য বৃহৎ ব্যাপার নয়।"

"তা হোক। কিন্তু মন নিয়েই ত মানুষ আর মানুষের সুবিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক না করে খর্ব করে যদি সভ্যতা গড়তে হয়—তোমাদের সেই সভ্যতায় আমি নেই, সত্যবান।"

চাকর খাবার নিয়ে এলো দু'জনের—সন্দেশ, সিঙ্গারা আর চা। ওর হাত থেকে ট্রে-টা সুরমা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলে।

"চা খাও ত সত্যবান? মিষ্টি আর নোনতা দোকানের হলেও খারাপ নয়—অন্তত অনেক সময় নষ্ট করে হাতে যা তৈরী করতুম তার চেয়ে ঢের ভালো।"

"গৃহস্থালীতে দেখা যায় আপনি পরের শ্রমকে কিনতেই ভালোবাসেন।"

"একটু খাবার তৈরী করে বা শেলাই করে গৃহস্থালীর বড় বেশি এগোয় না বরং সময় খরচ হয় প্রচুর। সে সময়টা বসে একটা বই পড়লেও অনেক উপকার আছে।"

সোফাটা সুরমার দিকে এগিয়ে নিয়ে বসল সত্যবান: "তা হলে বই-এ ডুবে থাকার অভ্যাস শুধু আমারি নেই বলুন—আপনিও সে পাপে পাপী!"

সুরমা এবার স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে হাসলে : "নাও—খাও। আমিও খাচ্ছি।"

এক টুকরো সন্দেশ হাতে নিয়ে সত্যবান জিজ্ঞাসা করলে : "বনানী কোথায় ?"

"সিনেমায় গেছে—দল বেঁধে ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে—"

বাইরে দরজায় ভারী জুতোর খটখট আওয়াজ হল। সুরমার সতর্ক কানে আওয়াজটা আসতেই ভাবছিল সে উঠে একবার দেখে আসবে কি না কে। আওয়াজটা খুব পরিচিত নয়।

কিন্তু সুরমার কৌতূহলকে মুহূর্তমাত্রও প্রশ্রয় দিলেন না আগন্তুক। ঘরের নরম হাল্কা আবহাওয়াটা ভয়ঙ্করতায় স্তব্ধ হয়ে উঠল তাঁর আবির্ভাবে। আশ্চর্য পট-পরিবর্তন! ম্যাকবেথে পোর্টারের দৃশ্যের পর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যের মত। এ-ঘরে ভদ্রলোকের চেহারাটা কিছুতেই মানায় না, এমন কি তাঁর বিলিতি পোশাকেও তিনি বেমানান। ঝড় খাওয়া একটা জাহাজ। সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা বিরাট, শক্ত কাঠামো। প্রৌঢ়ত্বের অপরাধই সবটুকু নয়—চোখের ঘোলাটে মণির চারপাশে সাদা বলতে আর কিছু নেই সেখানে শিরার লালচে শিকড় ছড়িয়ে গেছে। তামাটে মুখের উপর কালো কালো দাগ অস্পষ্ট হয়ে আছে, বাসা বেঁধেছে যেন চামড়ার নীচে অজস্র কীটাণু। নিকোটিনে ঠোঁটগুলো কালো, কুঁচকানো। ঠোঁটের উপর থেকে খানিকটা মাংস যেন টেনে উপরে তোলার চেষ্টা হয়েছিল তারপর তাতে ফুটো ফুটো করে দেওয়া হয়েছে নিশ্বাস নেবার জন্য।

সত্যবানের মনে হল সে একটা সাপ দেখছে—ফণাতে কালো কালো চক্র। কুঁকড়ে তার শরীর যেন আদ্ধেক হয়ে গেল।

সুরমা দাঁড়িয়ে গিয়ে এক পলকে চেয়েই চোখ নামিয়ে ফেললে।

হাসিতে মুখ বিকৃত করে ভদ্রলোক বললেন : "এখানে বসলে কোনো অপরাধ হবে না নিশ্চয়—" ফ্রাঙ্কেস্টাইনের অতিকায় মানুষটার মত যান্ত্রিক হাতে একটা সোফা টেনে নিলেন ভদ্রলোক।

"কেন এসেছেন আপনি?" অস্বাভাবিক সংযত কণ্ঠে সুরমা বললে।

" 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে উঠলুম—বেশ পদোন্নতি হল দেখছি।"

"যখন সম্বন্ধই উঠে গেছে আপনার সঙ্গে পরিচয়ও আমার থাকা উচিত নয়।"

"তা-হলে বললেই পারতে, 'কি চান আপনি'?"

"তা-ই এখন বলছি।"

"চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছি—উত্তর দাও নি। বোম্বের বোম্বেটেকে তাই হাওড়ার টিকেট কাটতে হল!"

"চিঠির উত্তর আপনি নিয়ে যান—খুকীকে আমি দোব না।"

সত্যবানের মনে হল হঠাৎ যেন সে কোনো অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছে—হনলুলু কি হাউই—যাদের আচার-আচরণ কথাবার্তা কিছুই তার জানা নেই। এম্নি পারিপার্শ্বিকে বসে থাকা নিজের চোখেই কেমন বিশ্রী লাগে। ভাবতে চেষ্টা করলে সে সতীর কথা। বিয়ের তারিখটা ও আজ মিস্টার সেনকে জানাবে। তার্কিক মানুষ মিস্টার সেন। যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সতীর মন ফিরিয়ে দেয়? সতী যখন জানাবে সে-কথা সত্যবানকে—কি করবে সত্যবান তখন? কি করা উচিত হবে তার? বিশ্রী কথায় হয়ত সে আক্রমণ করতে চাইবে সতীকে—নিজের মুখটা সত্যবান কল্পনা করতে চাইল, আশ্চর্য, সে-মুখ তার অনেকটা যেন এ-ভদ্রলোকের মুখের আদল নিয়ে

নিয়েছে। আর সতীর মুখেও সুরমার মুখটা যেন আস্তে আস্তে এসে বসে গেল! চোখ জ্বলতে লাগল সত্যবানের—আর ভাবা যায় না। ভাবলে সে থিসিসের বিষয়টা নিয়ে মনে মনে খানিকক্ষণ আলোচনা করবে—'স্কোপ্ অব্ ফিনান্স্ ইন্ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার।' সে যা বলেছে থিয়োরি হিসেবে নির্ভুল হতে পারে—কিন্তু তা কি বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব—প্রাক্‌টিক্যাল প্রপোজিশ্যন হিসেবে তা কি গভর্ণমেণ্টের উপর একটু জুলুম আনে না? প্রথমেই কৃষিঋণ সরকারের উপর গছিয়ে দেওয়া হল···

"কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো" ভদ্রলোক এবার নিজের চেহারা-মাফিক মুখভঙ্গী করে বসলেন: "গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে হিন্দু-বিয়েতে ডাইভোর্স চলে না। খুকীকে কেন, আমি তোমাকে শুদ্ধ দাবী করতে পারি।"

"আপনার টাকাপয়সার জোর থাকলে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন—কিন্তু আমি জানি আমাকে কেন, খুকীকেও আপনি নিতে পারবেন না।" সুরমা একটা পাথরের মূর্তির মত চেয়ে রইল।

"বাপের দেওয়া অনেকগুলো টাকার জোরেই ত একথা তুমি বলছ?"

"কোনো কথাই আমি বলতে চাই নে—আপনি চলে যান।"

"তাড়িয়ে দিচ্ছ ত?"

"যদি মনে করেন তাই।"

"আচ্ছা।" ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। স্নিগ্ধতাহীন একটা প্রখর দৃষ্টি মেলে সুরমা তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গচালনা অনুসরণ করছিল। সোফা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ভদ্রলোক একবার এদিক-ওদিক চাইলেন, তারপর ভারী জুতোর দ্রুত আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলেন।

থিসিসের সূত্রেও ছেদ ফেলে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে ছিল

সত্যবান। সুরমা খুব সহজ ভাবে বসে বললে : "চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—" খুব সহজ গলায় ডাকলে : "নিমু"

পর্দার আড়ালে চাকরের মুখ উঁকি দিতেই সুরমা অনুনয়ের সুরে বললে : "দু'কাপ চা নিয়ে আয় না বাবা—"

সুরমা সত্যবানের মুখের দিকে চেয়ে অনায়াসে বলতে লাগল : "উনি আমার স্বামী ছিলেন। তুমি বোধ হয় এতক্ষণ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলে।"

"নাঃ। উনি এসে প্রায়ই আপনাকে উত্যক্ত করেন বুঝি ?"

"ছাড়াছাড়ি হবার পর এই প্রথম দেখা।"

সত্যবান যেন থিঁতিয়ে গেছে। কোন্ কথা তার বলা উচিত কিছুতেই সে ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

"হিন্দু-বিয়ের এই দুর্গতি দেখে খুব আহত হয়েছ, সত্যবান ?" সুরমা সত্যবানকে হিন্দুসমাজের একজন প্রতিনিধি কল্পনা করে কথাটা ধারাল করে বললে।

"এ দুর্গতি স্বাভাবিক। বাইরে তার প্রকাশ নেই কেন না হিন্দু-আইন ডাইভোর্সের সুযোগ দেয় নি। আজ ডাইভোর্স বিল পাশ হয়ে যাক—কালই দেখতে পাবেন শতকরা নব্বুইটি হিন্দু-বিয়ে ভেঙে পড়েছে।"

"জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল যে পতিপরায়ণতা তাকে তুমি শৃঙ্খলা বলবে, না সত্য বলবে! মনের উপর পাশবিক অত্যাচার করে যে শৃঙ্খলা রাখতে হয় তাকে শৃঙ্খল বলাই কি ভালো নয় ? কোথায় এতে র‍্যাশান্যালিটির আভাস পেলে যাতে একে সত্য বলে ঘোষণা করতে পার ?"

"হিন্দু-বিয়ে আমি মানি নে, সুরমাদি—কাজেই আপনার প্রতিপক্ষ আমি নই।"

"তা জানি। শুনেছি তোমরা অসবর্ণ বিয়ে করছ—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তোমরা স্বেচ্ছায়, নিজের বিচারে একে অপরকে পছন্দ করে নিয়েছ। বিয়ে মানেই তাই—বিয়ে এ নয় যে পাত্রপাত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রপাত্রী সংগ্রহ করে শাঁকে ফুঁ দিতে হবে।"

"যদিও বা এম্নি সহৃদয় অভিভাবক মেলে যে ছেলের পছন্দ-অপছন্দকে একটু সম্মান দেখান—মেয়ের মতামতের প্রয়োজন-বোধ আপনি কোথায় দেখতে পাবেন না।"

"তা-ও যদি অভিভাবকরা চরিত্রবান হতেন না হয় মেয়েরা তাদের বিচারবোধের উপর নির্ভর করতে পারত। তাঁরা বলবেন, মাতাল, দুশ্চরিত্র স্বামীকেও দেবতাজ্ঞানে পূজো করতে। এ বর্বরতার তুলনা নেই, যে বর্বর-সমাজ বুড়ো হলে মেয়েমানুষদের কেটে খেয়ে ফেলে তাদের সমাজেও এ-বর্বরতার ঠাঁই হবে না।"

সত্যবান লক্ষ্য করে দেখল সুরমার মুখ আর মোনালিসার মত মনে হয় না—মনে হয় দেয়ালের নূরজাহানের মুখের মত। শত ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে থেকেও যেন একটা বৈধব্যের বিষণ্ণতা ফুটে বেরুচ্ছে। যে কালোপর্দায় তার নিগূঢ় সত্তা আবৃত তার রং সুন্দর, স্বচ্ছ মাংস আর ত্বক ভেদ করে চলে এসেছে। সুরমার গলায় উত্তাপ নেই, আছে ব্যথা—অন্তত সত্যবানের কানে এসে বাজতে লাগল ব্যথারই একটা মৃদু ঝিমঝিম শব্দ।

"সত্যবান", সুরমার কণ্ঠ বিষণ্ণতর : "কেন জানি নে বিয়েতেই আমি বিশ্বাস হারিয়েছি। রোমাঁ রোলাঁ-র কথা আর অবিশ্বাস করা যায় না : 'হ্যাপি ম্যারেজেস আর রেয়ার'। সত্যি বিয়েতে সুখ পাওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"

"এবার কিন্তু, সুরমাদি, আপনি আসুরিক চিকিৎসার পক্ষপাতী হয়ে উঠছেন। হাতে ফোঁড়া হল বলে হাতটা অ্যাম্পুটেট করা যায়

না। মানি বিয়েতে কতগুলো রোগ-বীজাণু ঢুকেছে—বীজাণু-গুলোকে মেরে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা উচিত—বীজাণুর উপর চটে গিয়ে বিয়ের টুঁটি চেপে ধরার কি দরকার ?"

"ফোঁড়া-পাঁচড়ার বীজাণু না হয়ে তা যদি ক্যান্‌সারের বীজাণু হয়! মৃত্যু ত তার অনিবার্য—তু'দিন আগেই না হয় সে শেষ হয়ে যাক।"

"স্ত্রী-পুরুষের মিলনেরই আপনি বিরোধী ?"

"দূর—তা কেন ?" আবার আগেকার মত হাসি এলো সুরমার ঠোঁটে।

"তবে ?"

"আমাকে তুমি শঙ্করাচার্যের চেলা পেয়েছ না কি ? কৌপীন পরে সবাই ব্রহ্মচর্য সাধন করবে এমন কল্পনা করার তুর্বুদ্ধিও আমার নেই আর এত বড় সমাজ-শত্রুও আমি নই।"

"স্ত্রী-পুরুষের স্বাস্থ্যকর মিলনকেই যদি বিয়ে বলা যায় আপনার আপত্তি তাতে কোন্‌ খানটায় ?"

"আমার আপত্তি সে-মিলনকে চিরন্তনের বজ্র আঁটুনি দিয়ে রাখায়।"

"স্বেচ্ছায় যারা এ-বন্ধনে এলো তারা যদি স্বেচ্ছায়ই এ-বন্ধনকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে চায় ?"

"তা হলে ভালো। কিন্তু ভবিষ্যৎ তুমি জানো না, ভবিষ্যতে এমন ত অনেক কারণ এসে জুটতে পারে যে সে-বন্ধন আলগা হয়ে গেল। কাজেই গোড়ায়ই এ-ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার দরকার কি ? দরকার কি ভেবে নেয়া এ-বন্ধন অচ্ছেদ্য হবে ?"

চা এলো। ট্রে থেকে সুরমা কাপ তু'টো তুলে নিলে।

শরীরে যেন কোনো বহিঃশত্রু প্রবেশ করেছে আর তাকে প্রতিরোধ করতে রক্তকণিকায় পড়ে গেছে চাঞ্চল্য। সত্যবানের

সমস্ত চেতনা তেম্নি তোলপাড় করতে লাগল সুরমার এ কথা-গুলোতে। কোনদিন কোনো কারণে সতীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হতে পারে এ-কথা কোনো রকমেই ভাবা যায় না। তা হলে কি মানে হল এতদিন ধরে একে অন্যকে জানবার, বুঝবার, ভালো-বাসার চেষ্টা করে? ভবিষ্যৎও বা কি এমন বিষাক্ত বীজ লুকিয়ে রেখেছে যা তাদের জীবনকে বিষবৃক্ষ করে তুলবে? অনেক অবস্থায় —অনেক প্রতিকূল আবহাওয়ায় সত্যবান মনে মনে নিজেদের নিক্ষেপ করে দেখেছে, ভাবান্তরের একটা মৃদু ঢেউও তার চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সে স্থির, নিশ্চল; জানে সতীও তাই। ধ্রুব-তারার দিকে যেন তারা চেয়ে আছে; বিবাহের এ-বৈদিক অনুষ্ঠান যেন জীবনের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে।

চার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুরমা জিজ্ঞাসা করলে: "তোমাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?"

"সাতুই আষাঢ়।"

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের বিরহ-ব্যথাটা উপভোগ করে নিয়ে?"

"সে যা-ই হোক—আপনি যাবেন কিন্তু।"

"সাক্ষী হতে?"

"অবিশ্বাসীকে সাক্ষী করব কোন ভরসায়?"

"তাহলে নিমন্ত্রণটা ইতরজন হিসেবে পাওয়া গেল, বল!" সুন্দর হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুললে সুরমা।

"কালক্রমে আচার আচরণ সবই ত বদলায়—নারায়ণশিলার বদলে মানুষ যখন সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করান হবে, মিষ্টান্নটাও কেবল সজ্জনদের ডেকেই বিতরণ করা যায়।"

"আমাকে সজ্জন মনে করলে কেউ তোমাকে বুদ্ধিমান বলবে না সত্যবান!"

"এ বিয়েতে সমাজের চোখে এম্নিতেই নিবু'দ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি !"

"তা দিয়েছ! তোমাকে দিয়ে একটা ভারী হাতে পণ ত আত্মীয়-স্বজনরা আশা করছেন !"

"এদিক দিয়ে আমি কিন্তু বাপমাকে নিরাশ করবার দায় থেকে মুক্ত—তাঁরা বেঁচে নেই।"

"ও—তাহলে আর কি! ইয়োর রাইট্ দেয়ার ইজ্ নান্ টু ডিস্‌প্যুট !"

"'নান' বলবেন না সুরমাদি! বাংলাদেশের যুবকদের শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই—বিয়ের ব্যাপারে বা বেকার অবস্থায় ব্যাঙের ছাতার মত এরা চারদিক থেকে গজিয়ে উঠে।"

"আঠারো শতাব্দীতে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে যারা কেচ্ছা-কীর্তন করত তাদেরি বংশধর !"

সত্যবান আর সুরমা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল! হাসতে হাসতেই পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বার করলে সত্যবান, কিন্তু তারপরই একটু জড়সড় হয়ে গেল যেন।

"খেতে পারি ?"

"বাঃ—নিশ্চয়।" সুরমা ঝরঝরে পরিষ্কার উত্তর দিলে।

সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে সত্যবান উঠে পড়ল: "আজ চলি, সুরমাদি।"

"আবার এসো একদিন—সতী যদি আসে খুব খুশি হব। সাতুই-র ত এখনো ঢের দেরী।"

"দশদিন।"

"বসে বসে দিন গুনছ—কেমন ?"

আবার একসঙ্গে দুজন হেসে উঠল। অর্কেষ্ট্রার সুসম্মিলিত সুরের মত তার ধ্বনি—তাতে একটুও ডিস্‌কর্ড্ নেই।

পাঁচ
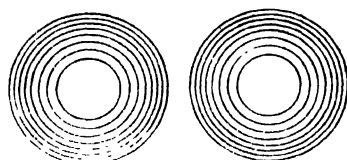
মেছুয়াবাজারের মেসের পাট তুলে রাসবিহারী এভিন্যুর ফ্লাটে এল সত্যবান। ছাত্রজীবনের উপর শেষ বারের মত যবনিকা টানা যেন কতকটা। মেসের চপলতা থেকে গৃহস্থালীর গাম্ভীর্যে আসা। গৃহস্থালী হলেও কানাইধরের গলিতে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে একটা খুপরীকে আশ্রয় করা যায় না—ভবিষ্যৎ ডক্টরের জন্য একটা ফ্ল্যাট আর রাসবিহারী এভিন্যুর আভিজাত্যটা অন্তত চাই। তাছাড়া বিয়ের দিন এগিয়ে এল অর্থাৎ ঘরসংসার করার দিন। আর মেসের মায়া করলে চলে না।

একাই সব করতে হত, মাস্টার মশাই জুটিয়ে দিলেন ছাপরা জেলার সীতারামকে। বেশ জোয়ান ছেলে। কাঁড়ি কাঁড়ি বই ডান-হাত বাঁ হাতে অনায়াসে টানাটানি করে সাজিয়ে ফেলেছে। এক-বিন্দু ঘামল না পর্যন্ত।

দেখাশুনোয় মাস্টার মশাই সাহায্য করেছেন বিস্তর। ঘর ধোয়ান, ইলেকট্রিক কনেকশ্যন আনা, জমাদার ঠিক করা—মাস্টার মশাইর কৃপায় খুঁটিনাটি আর কিছুই বাকি নেই। ব্যাচেলর মানুষ—এতটা বৈষয়িক কি করে হয়? সাংসারিক ব্যাপারে যার এত উৎসাহ বিয়ে না করাটা তাকে মানায় না। যাহোক সত্যবান অনেক বারের মত আবারও কৃতজ্ঞ হল মাস্টার মশাইর কাছে!

একটা ডেক্ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সত্যবান সীতারামের তৎপরতা দেখছিল, প্রতীক্ষা করছিল সতীর, (কেন না গৃহপ্রবেশের খবরটা সতীকে জানানো হয়েছে) আর ভাবছিল মাস্টার মশাইর কথা। সত্যি তাঁকে গুরু বলা যায়। জীবনকে যদি একটা মেসিন মনে করি, গুরু তার কলকব্জার মিস্ত্রি। থেমে থাকলে তাকে চালু করবার ভার গুরুর উপর। ফার্স্ট ইয়ারে যখন সত্যবান কলেজে এসে ভর্তি হল, তখন তার একরকম শোচনীয় অবস্থা—বাপ-মার শেখানো বুলি মুখস্তের পর মুখস্ত হয়ে গেছে। হেরিডিটি যারা মানে তারা তখন তাকে দেখলে খুবই খুশি হয়ে উঠত। খুশি হতেন মেণ্ডেল সাহেব ক্রমোসোমের কারিকুরিতে। কিন্তু সত্যবান যে খুশি ছিল না, কেমন যেন নিস্তেজ, বিবর্ণ মনে হত নিজেকে। 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনো খানে।' সেই আলাদা জগতের চেহারা নিয়ে এলেন মাস্টার মশাই—তাদের পোয়েট্রি সিলেকশন পড়াবার ভার ছিল যাঁর উপর। উইক্‌লি একজামিনের একটা খাতার মারফৎ সত্যবানের সঙ্গে তাঁর পরিচয়—সে-পরিচয় ক্রমেই গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়েছে। গুরু শিষ্য এখন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মাস্টার মশাই বলতেন: "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে—বুঝলে সত্য? দেহের সীমায় আবদ্ধ আছি বলেই বিশাল মুক্তির তৃষ্ণায় ছটফট করা দরকার। মনের মধ্যে সমুদ্র অনুভব করো, পাতকুয়ো জমিয়ে তুলো না। যা পেয়েছিলে, যা পেয়েছ, যা পাবে সব সময়ই তা থেকে তুমি অন্তত এক ইঞ্চি উপরে—মনে রেখো।"

হাসির মৃদুতায় খানিকটা স্মার্ট হয়ে সত্যবান বলত: "আপনি কিন্তু আগাগোড়া রবিঠাকুরের সাক্‌রেদ।"

ব্যস্ত হয়ে মাস্টার মশাই জিভ কাটতেন: "এত ছোট অত বড়র সাক্‌রেদ হতে পারে না!"

কলেজের মাস্টার যে খাওয়া, ঘুম, বংশবৃদ্ধি আর বেতন বাড়াবার জন্য প্রিন্সিপালের তাঁবেদারী করা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে, নিখিল ভট্চাযকে দেখবার আগে সত্যবান ভাবতে পারে নি। তাঁকে দেখে সত্যবান অভিভূতই হল বলা যায়।

পৈতে ফেলে দিলে সত্যবান, কেন না মাস্টার মশাই-এর এ বালাই ছিল না।

মাস্টার মশাইকে নিয়ে খানিকক্ষণ অতীতে বিচরণ করে এল সত্যবান। কিন্তু নিরেট বর্তমান নিয়ে উপস্থিত হল সীতারাম। কিছু বর্তন না কি কেনাকাটি করতে হবে, কয়লা-ঘুঁটে কেনা আছে। আবার মাস্টার মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা নোট বার করে দিলে সত্যবান। জাঁদরেল টিকিটা দুলিয়ে সীতারাম অন্তর্হিত হল।

বেশ হত কিন্তু এখন সতী এলে। তাদের ছোট এই নীড়ে শুধু তারা দুজন—আগামী জীবনের ভূমিকাটা তৈরী হয়ে যেত। সে জীবন সম্বন্ধে কেমন একটা আশঙ্কা আছে সত্যবানের। সুখের অনাবিল অনুভূতিতে সব সময়ই আশঙ্কা থাকে। সতীকে পাওয়া এত সহজ হয়ে গেল বলেই হয়ত বা এ আশঙ্কা। কোনো দিক থেকে একটু ঝড় উঠল না, ধুলো উড়ল না—অথচ কত প্রস্তুতই না তার জন্য তারা ছিল। বিরোধিতাকে জয় করবার সঞ্চিত শক্তি শরীরে অলস বসে থেকে স্নায়ুতে এখন কি প্রতিক্রিয়া চালায়—তাও একটা আশঙ্কার কারণ হতে পারে। অহেতুক ভেবে চলল সত্যবান। একটা সূত্র নিয়ে তার পেছনে অনেক দূর চলে যাওয়া বেশ ভালো লাগছিল। বই খুলে বসতে পর্যন্ত ইচ্ছা করছিল না। এ ধরণের চিন্তার জন্য কোনো সহায়কের দরকার নেই—নিজের মনকে একা পেলেই চলে। আর কোনো কাজ নেই যেন তার। দীর্ঘ যাত্রার শেষে জাহাজ এসে বন্দরে

নোঙর ফেলেছে—বন্দরের জলের ছোট ছোট নিরুপদ্রব করতালি শোনাই এখন তার কাজ।

"দিব্যি আছ, যাহোক—"

চমকে সত্যবান ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, রজত।

"মেস ছেড়ে দিব্যি চম্পট! আমি ত গিয়ে বোকা বনি আর কি" টানা হেঁচড়া করে একটা চেয়ার সত্যবানের সামনে এনে রজত বসে পড়ল।

"বোকা বনবার ত কোনো কারণ নেই। দরজায় আমার নতুন ঠিকানা ত ঝুলিয়েই এসেছি।"

"কিন্তু পেট্রোলের পয়সাটা, আধ গ্যালন ত পুড়ল—"

"সে না হয় এক সময় নিয়ে নিস্—"

"দান খয়রাত করছিস যে বড় আজকাল—" চৌকো মুখে রজত বিরাট করে হাসল।

"সে পুণ্য অর্জনের আমাদের সুযোগ কোথায়? বরং তোমাদেরই তা একচেটিয়া। ব্যাঙ্কার মানুষ—দেশের অর্থ সরবরাহ করছ—"

"আর ব্যাখ্যা দিতে হবে না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়া ছাড়া যে আমাদের আর কিছু কাজ নেই তা তোমার চেয়ে আমরাই বেশি জানি—ব্যাঙ্কিং-নিয়ে থিসিস্ লিখলেই চলে না।"

"মুস্কিল কি জানিস রজত, ব্যাঙ্কিং বলতে তোরা শুধু লোন কোম্পানীই বুঝিস—মহাজনী ব্যবসা—কিন্তু ব্যাঙ্কিং-এর চরিত্র তা নয়।"

"যাক্ বাবা, সে তর্ক এখন নয়। জাতকে জাত আমরা চরিত্রহীন, আর ব্যাঙ্কিং হবে চরিত্রবান!"

"চরিত্র ভালো করা শিক্ষা ও সভ্যতারই লক্ষণ।"

"বাবা, দুপয়সা রোজগারের চেষ্টা করছি—কেন বাদ সাধছিস।

যা বিদ্যে তা নিয়ে মাথা কুটলেও ত চাকরি হত না আর কাকার যা টাকা তারও কোনদিন সদ্ব্যবহার হত না—বিলিতি ধরণে কয়েকদিন মহাজনী ব্যবসাই করতে দে।”

“তাত করছিসই—বাধা ত কেউ দিচ্ছে না—”

“ঐ যে মাঝে মাঝে তোমরা পণ্ডিতরা খোঁচাতে এস—বল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্কিং-এগ্রিকালচ্যারেল ফিনান্স!”

“তাতে তোমাদের আঁচড় লাগবে না—তোমরা বিলক্ষণই জানো মহাজনো যেন গত সঃ পন্থা—অর্থাৎ মহাজনীই পন্থা—”

সত্যবানের চেয়ে রজতই বেশি শব্দ করে হেসে উঠল। সত্যবান ভালো করেই জানে যে আঘাতও রজতের উপর পিছলে যায়। এত বয়েস পর্যন্ত দুর্ভেদ্যতা সে সযত্নে রক্ষা করে এল! অবশ্য মানুষের মনের উপর টাকা একটা জোরালো বার্নিশ চড়িয়ে দিতে পারে—আর তার জোরেই নিন্দাপ্রশংসাকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করে যায়। কিন্তু রজতের বেলায় যেন ঠিক তা নয়। টাকা সম্বন্ধে সচেতন হবার আগেও মন তার এস্‌বেস্‌টসের পোশাক পরাই ছিল! হতে পারে যে টাকা সেই সুদৃঢ় দুর্গের গায়ে আরেকটা আস্তর ফেলেছে। হতে পারে যে, সেই দুর্গের যে-দেয়াল ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছিল—তা মেরামত হয়ে গেছে টাকারই বার্নিশে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সত্যবান বললে, “এ অভ্যাসটা আর তোর হল না।”

“এম্নিতেই বহু বদঅভ্যাস আছে—আর ওটার প্রলোভন দেখিও না।”

“বদঅভ্যাস থাকলে ত তুই বেঁচে যেতিস—তোর ভেতরকার পাথরচাপা অগ্নিগিরিটা ধুঁয়ো ছেড়ে বাঁচত!”

“অগ্নিগিরি যে আছে তার প্রমাণ?” মুখের পুরুচামড়ায় কোনো

ছোটখাট রেখাই আসে না রজতের—তাই মুখ থেকে হাসি বিদেয় হলে সব সময়ই তাকে গম্ভীর মনে হয়।

"তার প্রমাণ অবিশ্যি হাঁ করে কিছু নেই—"

"তবে মুখ লুকিয়েও কিছু নেই।"

"তা কি ঠিক বলা যায়? ধর—সুরমাদি-ই তার একটা প্রমাণ।"

"যাঃ—সুরমাদি আমার ডিপোজিটর—তারপর সুরমাদি।"

"তাই ত! সুরমাদি বলে যতটুকু আকর্ষণ তা শুধু অগ্নিগিরির মন্ত্রণায়।"

"ভালো কথা," রজত মোড় ঘুরল: "সুরমাদির বাড়ি না কি গিয়েছিলি ওদিন।"

"হাঁ।"

"দারুণ আলাপী আর স্মার্ট—"

"এক অদ্ভুত ভদ্রলোকের সঙ্গেও দেখা হল—যিনি সুরমাদির স্বামী ছিলেন।"

"ও, পরেশ রায়? উনি ত বোম্বে থাকেন—একটা সিনেমা কোম্পানীর পেছু নিয়েছেন—এসেছিলেন না কি?"

"এসে ঝগড়া করে গেলেন সুরমাদির সঙ্গে।"

"বিদ্বান লোক, এম্-এস্-সি। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশ ডিবচ্। চার পাঁচ বছর যে সুরমাদি ওর সঙ্গে কি করে ছিলেন ভাবতে অবাক লাগে।"

"একটা লোককে ভালো করে চিনতে চার পাঁচ বছর ত লাগেই।"

"কিন্তু সে-দিনগুলো যে তাঁর কি করে কাটতো আমি কিছু কিছু শুনেছি—তাই পাঁচবছর সেই নরকবাস অসম্ভব মনে হয়।"

"হঠাৎ একদিনের একটা ধাক্কায় কোনো সংস্কারকে জয় করা যায় না—যদিও যায় তা স্থায়ী হয় না। অত্যন্ত শিক্ষিত হিন্দু মেয়ের পক্ষেও পতিপরায়ণতার সংস্কার ভুলে যাওয়া একদিনে সম্ভব নয়।"

সত্যবানের বক্তৃতাকে রজত ভয় করে। সত্যবান তা জানে। আর জানে বলেই রজতকে দেখলে তার জিভ মাস্টারিপণার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। টাকার দৌড়ে রজতকে সে কোনদিন নাগাল পাবে না বলেই হয়ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে চায়—এও এক ধরণের মানসিক বিকার। সত্যবান যে বুঝতে পারে না তা নয়—তবু রজত সম্বন্ধে নিজকে সে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে না।

"মুখে-মুখে অনেক প্রশংসা আমরা করতে পারি" সত্যবান রজতের দিকে একটা সূক্ষ্ম সূচ এগিয়ে চলল : "কিন্তু সমাজে সুরমাদির কোনো স্টেটাস্ দিতে রাজী হব কি? ও যদি আজ বিয়ে করে আবার, আমরা ক'জন তা ভালো চোখে দেখব?"

সত্যবান এখন সমাজের নাড়িভুঁড়ি বার করতে শুরু করবে রজত আশঙ্কা করলে—ছোট একটা হাই তোলার চেষ্টা করে তাই বললে : "তোদের বিয়ে কবে হচ্ছে বলত।"

"এ বিয়েতে তোর আপত্তি নেই?"

"আমার আপত্তি? মানে?"

"তোর মানে তোদের হিন্দুসমাজের। তোরাই ত সমাজের মাথা —টাকার মালিক!"

"তোমরা ত বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছ—রাহাজানি ত নয়, কাজেই টাকার মালিকের ভয়টা কোথায়!"

রজতের পিছলে যাবার চেষ্টা দেখে সত্যবানের একটু করুণাই হল। হঠাৎ আজ সে রজতের উপর একটু অতিরিক্ত বিমুখ হয়ে উঠল কেন—সত্যবান একবার আত্মসমালোচনা করতে চাইল। সুরমাদির সঙ্গে রজতের ঘনিষ্ঠতা কি সত্যবান সহ্য করতে পারছে না? তাতে ত সত্যবানের কোনো অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই—সুরমাদির মনের তালিকায় পয়লা নাম থাকবে সত্যবানের, সত্যবানের কি এমন

কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে? রজতকে সে কি ভেবে নিলে প্রতিদ্বন্দ্বী? নিশ্চয় নয়। উচ্চারণ করে তার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল—নিশ্চয় নয়। নিজের কানকে শুনিয়ে, চেতনাকে শুনিয়ে বলতে চাইল সে—নিশ্চয় নয়। তবু কেন রজতকে আজ এত অসহ্য লাগছে? সত্যবান নিজের মন নিয়ে নিজেই লজ্জিত হল।

"বিয়েতে কি সাহায্য তুই করবি বলত রজত—" সত্যবান স্বাভাবিকতায় ফিরে এল।

"কোমর বেঁধে দৌড়োদৌড়ি করবার যো ত আর রাখিস নি—তাহলে না হয় অ্যাকৃটিভিটি দেখানো যেত! কাজের মধ্যে ত রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে দুটো শপথ পড়া!"

"কিন্তু পার্টিতে ত কাজ আছে!"

"সে আর একটা কাজ! তাছাড়া পার্টি দেবার ভদ্রতাজ্ঞান তোর আছে নাকি—গৃহপ্রবেশের দিন যেচে দেখা করতে এলুম—এক কাপ চা পর্যন্ত এগিয়ে দিলি নে!"

"সীতারাম বাজার থেকে ফিরলে তাকে খোসামোদ করে এক কাপ চা খেতে পারিস।"

"তার চেয়ে বলতেও পারতিস ডুয়ার্সের বাগানে গিয়ে চা পাতা তুলে আনো—চাঁদপাল ঘাটে গিয়ে দেখে এসো জাভা থেকে চিনির স্টীমারটা এল কিনা—"

বাইরে খুটখাট শব্দ হতেই সত্যবান বললে—"জাভা ডুয়ার্সের সমস্যাটা সমাধান হবে বোধ হয়—হয়ত সীতারাম এল—"

কোথায় সীতারাম! একটা ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে মাস্টার মশাই এসে ঘরে ঢুকলেন। সত্যবান চেয়ার ছেড়ে টেবিলের উপর আশ্রয় নিলে: "সারাটা দিন নেপথ্যেই রয়ে গেলেন মাস্টারমশাই—"

"রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবার সাহস আমার কোনদিনই নেই। যাক্ চেয়ারটা দিয়ে ভালোই করলে—টেবিলের উপর চড়ে বসা এ বয়সে পোষাত না।"

"একে চেনেন বোধ হয়—রজত দত্ত—আমাদের সঙ্গে পড়েছে—এখন ব্যাঙ্কার—"

"চেনা মুখ।"

অল্প একটু হাসতে চেষ্টা করলে রজত যার ফলে তাকে আরো গম্ভীর দেখায়। সত্যবান পরিচয়টাকে তাড়াতাড়ি স্পষ্ট করে দিতে চাইলে: "আমাদের কবিতার মাস্টার মশাই—"

"ওর কাছে চেনামুখ হতে পারি কিন্তু কবিতার সঙ্গে চেনা ত আমার কোনো কালেই ছিল না—"

"বেঁচে গেছ রজত" মাস্টার মশাই অন্তরঙ্গ হয়ে এলেন: "এই শেঠের জগতে তাহলে বাঁচতে পারতে না—রোমে রোমান হওয়াই উচিত, শেঠের জগতে জগত-শেঠ।" কথাগুলোতে যতটা অনুকূল হাওয়া পাওয়া গেল তাতেই রজত হাসির মত করে হেসে উঠল। বোঝা গেল 'চেনামুখ'-এর মত হ্রস্ব ও আবেগহীন কথায় রজত সন্তুষ্ট হতে পারে নি। অন্তত মাস্টার মশাই তা বুঝে নিয়েছিলেন।

"তোমারও খুশি হবার একটু খবর আছে সত্যবান—" 'তোমার-ও' কথাটায় 'ও' যোগ করা শুধু রজতের জন্যে—মাস্টার মশাই ভাবলেন ভাষার সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে রজতের জ্ঞান আছে: "সতী পাশ করেছে, চালাক মেয়ে—ও পাশ না করে যায় কোথায়?"

"ওয়াল্ আপ্ করেছে রেজাল্ট?" সত্যবানকে আগ্রহে একটু উজ্জ্বল দেখালে।

"না হে—জঠর থেকে বার করে এনেছি—নাও রোল নাম্বার মিলিয়ে দেখ—"

চিরকুটটা মূল্যবান সামগ্রীর মত তুলে নিলে সত্যবান—এক পলকের গভীর মনোযোগ বুলিয়ে আনলে ওর উপর।

"কি রকম অন্যায় দেখুন স্যার" রজত প্রসন্ন মনে বলে যেতে লাগল: "সতু গৃহপ্রবেশ করলে আর সতীর পাশের খবর এল তবু আমরা খালি পেটে বসে আছি।"

"গৃহপ্রবেশ মানে? একি আমার বাড়ি—ভাড়াটে বাড়িতে আবার গৃহপ্রবেশ কি?"

"ডিপোজিটের টাকার স্ফীতি দেখে আমাদের তোমরা বড়লোক ভাব না?"

"পরের জিনিসকে নিজের ভেবে নেওয়া অন্যায় নয়, নিজের করে নেওয়াটাই অন্যায়।" মাস্টার মশাই সালিশী করলেন।

"নিজের ভাবতেও হয়ত সতুর আপত্তি আছে—ভীষণ ইন্‌ডিভি-জ্যুয়্যালিষ্ট ও।"

চরিত্রের একটা দিকে স্পর্শ লাগল সত্যবানের—আর সব চেয়ে আশ্চর্য রজতও এদিকটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। হয় এদিকটা তার দৃষ্টিকটু হয়ে প্রকাশিত নয় ত রজতকে সে যতটা বোকা ভাবে তা সে নয়। আত্মরক্ষা করে সত্যবান ভেবে নিলে পুরু চামড়ার নীচে রজত সত্যি একটা সজাগ মন নিয়ে বসে আছে। সেখানে সত্যবানের চেহারা যা রজতের মুখের ভাষায় সে তা নয়। সেখানে সুরমাদির চেহারাটাও হয়ত ঠিক সুরমাদির মত নয়।

সত্যবানের ব্রিফ নিলেন মাস্টার মশাই: "মেধার আভিজাত্য কথাটা যদি মানো রজত, আর তা না মানবার কোনো কারণ নেই, তাহলে ইন্‌ডিভিজ্যুয়্যালিজ্‌ম্ কান টানলে মাথা আসবার মত করে এসে পড়ে। সাধারণের মন নিয়ে শেলী ব্রাউনিঙ রবীন্দ্রনাথ তৈরী নন, তাঁদের সাহিত্য তাঁদের ব্যক্তিগত মনের উৎকর্ষই প্রতিফলিত

করে। রোমান্টিক সাহিত্যের মত এত বড় সাহিত্য মানুষের সভ্যতা পেত না যদি না ইন্‌ডিভিজুয়্যালিজ্‌মের জন্ম হত।"

"আমাদের মত সাধারণ মানুষই যখন পৃথিবীতে বেশী তখন সে সাহিত্যে আমাদের কি লাভ?"

"সমতল যদি বলে গৌরীশৃঙ্গের কি প্রয়োজন, পৃথিবীর ভেতরকার আগুন কি সে কথা শুনবে? সভ্যতার রীতিই উপরের দিকে যাওয়া, মনীষীদের আশ্রয় করে তা উপরের দিকেই যাবে, সাধারণের মন রাখতে নীচের দিকে নেমে আসবে না!"

সত্যবান চুপ করেই ছিল। মাস্টার মশাই মাস্টার মশাইর মতই কথাগুলো বলে যাচ্ছেন—এ ধারার কথা শুনে সে চিরকালই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ সত্যবানেরও কেমন মনে হল, কথাগুলো শুনতে খারাপ না লাগলেও তাতে যেন যুক্তি বা বিচারের তেমন ধার নেই। অবিশ্যি সে নিজে যে কোনো বিরুদ্ধযুক্তি খাড়া করতে পারবে তা নয় কিন্তু সে না জানলেও যেন তেমন যুক্তি দেবার লোক আছে। রজত সে দলের লোক হতে পারে না—এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত জীবন রজতের নয়। মিস্টার সেন কি পারতেন? বৈজ্ঞানিক মন হলেও মেধার বৈশিষ্ট্যকে মেনে না নেবার মত বিদ্রোহ তাঁর মধ্যে নেই। সুরমাদি? সুরমাদি ত মাস্টার মশাই-এরই দলের লোক, মাস্টার মশাই যুক্তির ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছেন, সুরমাদি নিয়েছেন আবেগের ঝাণ্ডা। কিন্তু এরা কেউ না হলেও কেউ না কেউ এর বিরুদ্ধ-দলে আছে—মনে করতে পারছে না সত্যবান কিন্তু তারা আছে। কোথায়, কোন্ বই-এ পড়ল সে তাদের কথা? না কি নিজের মনই তার এদের গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে চায়—আম্‌ব্রার গভীরতর ছায়া পার হয়ে সে কি এসে পড়ছে পেন্‌আম্‌ব্রার অস্পষ্ট স্বচ্ছতায়? মনে মনে অস্থির হয়েও সত্যবান চুপ করে রইল।

রজত সূক্ষ্মতায় না গিয়ে মোটা ভাষায় বললে : "অরবিন্দ যোগ-সাধনা করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবেন—যাক্ না দেশের কোটি কোটি লোক অধঃপাতে !"

"দেশের লোকের মুখ চেয়ে অরবিন্দ তার মহৎ সাধনা বিসর্জন দিয়ে বসে থাকবেন, এ-আব্দারই বা তোমাদের কেন ?"

"যোগসাধনা যদি মহৎ হয়ে থাকে সে-মাহাত্ম্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব কোন অপরাধে ? আমাদেরও তিনি তুলে নিন তাঁর ঊর্ধ্বযাত্রায়—তাতে যদি তাঁর গতির খানিকটা হ্রাসই হয়, তাতে ক্ষতি কি ?" রজত থেমে-থেমে কথাগুলো বললে, যেন আক্রমণের ঠিক সূত্র সে খুঁজে পাচ্ছে না।

"অমৃত যে দান করবেন, সে ভাণ্ড তোমাদের আছে ? তাঁর ধ্যান-ধারণা তোমাদের মগজে কুলোবে না।"

"ধ্যানধারণাকে তিনি একটু খাটো করে আনুন না—যাতে আমাদের মগজেও কুলোয় ! তিনি ত আমাদের মতই মানুষ, একটু মানুষ হোন না তিনি, অমানুষিক হবার চেষ্টা না করে !"

মাস্টার মশাই হাসলেন। হাসছিলেন তিনি বরাবরই, এবার হাসিটা তাকে একটু উজ্জ্বল করে তুলল : " 'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি'—তার সন্ধান সবাই পায় না রজত। তোমরা সবাই মানুষ কিন্তু তার মধ্যে যে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সে-ই অমৃতের অধিকারী। আবিষ্কার করাটাই আসল, তা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, অরবিন্দ করেছেন আর আমরা সবাই ভাণ্ডের বোঝা বইছি। এটা দানের কথা নয়, তর্কে যা বলেছি সে-কথা ছেড়ে দাও, আমি গুরুবাদী নই যে দানের প্রয়োজনীয়তা মানব। আসল কথা হচ্ছে আত্মচর্চা, নিজের সন্ধান আমরা নিজেরা পাই নি, যে কারণেই হোক বাধা পড়েছে—সেখানেই আমাদের পরাজয়, মেধার পরাজয়।"

মনে হল মাস্টার মশাই সভাপতির অভিভাষণ শেষ করলেন—যার পর আর কোনো বক্তার প্রশ্রয় নেই।

রজত খুব অখুশি হল না; মাস্টার মশাই-এর বক্তৃতা বা যুক্তি তার কারণ নয়। সে যে এত কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছে, যা সে কোনো দিন সাহস করে নি বা আশা করে নি, তাতেই সে তৃপ্তি পাচ্ছিল। সাধারণের পক্ষ নিয়ে দু'একটা কথা বলা তার ইদানীংকার অভ্যাস—সাধারণকে নিয়ে তার কারবার করতে হয় বলে। কিন্তু খুশি হল না সত্যবান। মাস্টার মশাই বললেন বটে তিনি গুরুবাদী নন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তিনিও কি নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন বা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন? কি মানে হয় তাঁর অবিবাহিত থাকবার? সুরমাদি উপস্থিত থাকলে আজ নিশ্চয় বলতেন—নিজের মনকেই তিনি নিজের মন থেকে লুকোচ্ছেন। বরং সুরমাদিকে বলা যায় মানুষ হিসেবে কতকটা সার্থক। অন্তত তাঁর বলিষ্ঠ ইচ্ছা আছে আর তা পূরণ করবার দুর্দান্ত সাহস আছে। সুরমাদির চোখের রং-ই মাস্টার মশাই-এর চোখে নাই। কেমন নিস্তেজ, নিস্প্রভ যেন তিনি হয়ে পড়েছেন আজকাল। গোপনতার অভিশাপ! নিজেকে অনাবৃত, প্রকাশ্য করে তুলতে ভয় পান! —ভিক্টোরীয় যুগের অস্বাস্থ্যকর শালীনতাকে টেনে এনে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন—বাংলাদেশের বহু ডানপিটে ছেলের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা তাতে নষ্ট হয়ে গেছে। মাস্টার মশাই হয়ত তাদেরই একজন। রবীন্দ্রনাথ যে সীমাবদ্ধ মুক্তির কথা বলেছেন তার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে খেতে মাস্টার মশাই স্বাভাবিক বৃহত্তর মুক্তির স্বাদ হারিয়ে ফেলেছেন—কিন্তু তার ছায়া তাঁর পেছু নিয়েছে, সেই ছায়াতেই আজ তাঁকে এত ম্লান দেখায়।

হঠাৎ সত্যবানের দিকে চেয়ে মাস্টার মশাই বললেন : "এত কথার শেষে সত্যি আমাদের চা কোথায়, সত্যবান ?"

ইলেক্ট্রিক্ চার্জে মরা ব্যাং-এর নড়াচড়ার মত একটা গতি দেখতে পেলে সত্যবান মাস্টার মশাইর দেহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসায় অভিভূত থাকলে তাকে চলবে না—সত্যি, চা-র যোগাড় করা চাই। একটা ছোট লাফ দিয়ে টেবিল থেকে সে মেঝের উপর দাঁড়াল।

সীতারামকে দেখা গেল প্রায় একটা ফেরীওয়ালার কুলী হয়ে ঘরে ঢুকেছে।

ছয়

২১ জুন ১৯৪১। রাত্রি ৯টা
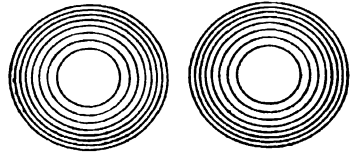
সতী আজকাল তাই করে। দেহকেই সে দূত হিসেবে পাঠায় সত্যবানের কাছে পৌছুঁবার জন্য। হয় সে মনে করে মানসিক সরঞ্জামগুলো তার ক্ষয় হয়ে গেছে, দেহটাকেই এখন একমাত্র যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে—নয় ভাবে যে মানসিক সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল ত শুধু দেহকেই সত্যবানের মনে বড় করে দেখাবার জন্যে। এই পনেরো বছরের পরিচয়ের মধ্যে সত্যবানকে এখন যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখায়; শুধু সতীর কাছ থেকে নয়, পনেরো বছরের পুরোনো বাড়ি থেকে, ছেলে-মেয়ে থেকে কেমন যেন আলাদা হয়ে গেছে সত্যবান আজকাল। সতী লক্ষ্য করে। তাই সে সত্যবানকে এই পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে চায়। আর তাই পুরোনো পরিচিত এই মদ পরিবেশন করে। তাতে সত্যবানের স্নায়ুতে যে চঞ্চলতা আসে না এমন নয়, মুহূর্তের জন্য হলেও একটা শারীরিক অনুভূতি আশ্চর্য তীব্রতায় সতীর সান্নিধ্য খুঁজে বেড়ায়। সতী নিশ্চিন্ত হতে পারে।

একটু সরে বসল সতী—কিন্তু মানসিক অন্তরঙ্গতার নিবিড় হয়ে এল: "খাবার দোব? খাবে এখন?"

সতীর দেহের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছে এখনও সত্যবান: "খোকা খেয়ে নিক ত—"

"বেশ! সে এখনও তোমার জন্যে বসে আছে কি না!"

"তুমি?"

"তোমার আগে খাই কখনো?"

"একসঙ্গে?"

"না! এখন আর ভালো ঠেকে না চোখে।"

সত্যবানের বিচার-বুদ্ধিতে বিশ্রী শোনায় কথাটা কিন্তু মনে মনে যেন একটু খুশিই হয়ে ওঠে। মনের বিচার শুরু করে সে। সত্যবান-কেই একান্তভাবে ভালোবাসবে তা ছাড়া কি সতীর কাছে আর কিছু চেয়েছিল সত্যবান? অচঞ্চল ভালোবাসাকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য আপনা থেকেই ভক্তির আর শ্রদ্ধার বর্ম গড়ে ওঠে। প্রেমিকার যে আঁচল ধরে তুমি টেনেছ তা-ই সে গলায় জড়িয়ে তোমাকে স্ত্রীর প্রণাম জানাবে। খুবই স্বাভাবিক। সতীর দোষ নেই। যদি ভালোবাসাকে একই ধারায় বইয়ে নিতে চাও, তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের এম্নি অধঃপতন অনিবার্য। মেয়েদের মুক্তি দিতে কি তোমরা চাও, অন্তত ভালোবাসার ক্ষেত্রে? সরোবরের মত উচ্ছ্বাসহীনতায় সতীকে যে আজ বহুদিন পরে সত্যবানের কাছে পঙ্গু, প্রাণহীন মনে হয়, সতীর ভালোবাসায় মুক্তিকে কি সে কখনো সহ্য করতে পারত? —এখনও কি সে তা পারে? আজও—এই যৌবনের শেষে হয়ত সতীর মন ফুলন্ত হয়ে উঠবে যদি সে অসঙ্কোচ, সংস্কারের নাগপাশ এড়িয়ে আরো কোনো এক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে। সেখানেই সুরমাদির উজ্জ্বলতা, মনকে তিনি ভালোবাসার বদ্ধ ঘোলাজলে নষ্ট হতে দেন নি। পরেশরায়ের স্ত্রী ছিলেন বলে রজতকে তিনি ভালোবাসতে সঙ্কুচিত নন। মেয়েদের সমান অধিকার সত্যবান মনে-প্রাণে সমর্থন করে। মনেপ্রাণে সমর্থন করতে সত্যি সে পারে কি? মনে তার কতকগুলো প্রগতিশীল ধারণা আছে। সে-ধারণার অনুযায়ী

যদি সতী চলতে পারে তবেই সে খুশি। কিন্তু সে-ধারণাগুলো যে অধিকারের সমস্ত সর্তই পরিপূরণ করে তা ত নয়। সমস্ত বিষয়ে সতীকে সে মুক্তি দিতে পারে, অন্তত পারে নিজের সমান অধিকার দিতে কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে তার মুক্তি কই?—এমন কি সমান অধিকারই বা কোথায়? সত্যবান কি জোর করে বলতে পারে, সুরমাদিকে সে একমুহূর্তের জন্যও ভালোবাসে নি? তারপর বনানী? আপনা থেকেই সত্যবান সঙ্কোচে ম্লান হয়ে উঠল।

"রাগ করলে?" সতীও সহানুভূতিতেই যেন ম্লান দেখালে একটু: "চলো আজ না-হয় এক সঙ্গেই খাব।"

"তাহলে এখানেই আনতে বলে দাও, এই টেবিলে।"

"বেশ।" সতী ছোট্ট গোলমত একটু হাসলে।

"তোমার পছন্দ হচ্ছে না, না?" সত্যবানও একটু হাসির মত চেষ্টা করলে।

"আমার আবার পছন্দ কি? তোমার হলেই হল।"

"কেন, তোমার একটা পছন্দ থাকতে নেই?"

"থেকে লাভ?"

"কম্‌পেয়ার কি কন্‌ট্রাস্ট করা যায় ত!"

"কন্‌ট্রাস্ট করবার মত পছন্দ আমার হবে, তুমি ভাবতে পার?"

"ভাবতে পারিনে বলেই ভালো লাগে না, সত্যি ভালো লাগে না।" সমস্ত শরীরটা যেন সত্যবানের হঠাৎ শক্ত হয়ে এল।

সতী বুঝতে চেষ্টা করল সত্যবানকে। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে—আবেগ দিয়ে নয়। তাই সে অভিভূত হল না। কিন্তু একটু উদাস কণ্ঠেই বলল: "তাই ভালো লাগত কি যদি তোমার ভালোবাসার, তোমার ইচ্ছার অমর্যদা করতুম?"

ভালো লাগত কি না সত্যবান জানে না। তবু এই অবস্থা

থেকে—সতী যে শুধু তার ইচ্ছার অনুগমন করছে—এই অসহ্য অবস্থা থেকে সে মুক্তি পেত। আজ যদি সতী বিপরীত দিকে ছুটতে ছুটতে তার চোখের আড়ালও হয়ে যায় সত্যবানের বিচারে তবু সে সার্থক। কিন্তু সত্যবানের মনে যে একটা অরক্ষিত জায়গা আছে, ভালো লাগা মন্দ লাগার সূক্ষ্ম তন্তুতে যা আচ্ছন্ন—সেখান থেকে কি এর কোনো প্রতিবাদ হবে না? কি যে হবে সত্যবান বুঝতে চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না। জটিল অর্থনীতির সূত্র থেকেও তা জটিলতর, সেখানে তার বৈজ্ঞানিক মেধা হার মেনে যায়। হয়ত এ তার নিজের সত্তারই একটা দ্বন্দ্ব—সতী সেখানে উপলক্ষ মাত্র—সংস্কারমুক্ত বিচারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তার ঘোলাটে অনুভূতিগুলোর।

একটু স্তিমিত হয়েই সত্যবান বললে: "তোমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিলেই আমার ইচ্ছার অমর্যাদা হবে এ তুমি জানো কি করে?"

"তা জানি। তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে।"

"কিন্তু তুমিও মানুষ যার বিচার-বিবেচনা থাকা উচিত।"

"আমি একা মানুষ হতে গেলে কি চারিদিকের লোকেরা তা স্বীকার করে নেবে—না আমিও শান্তি পাব?"

"চারদিকের লোকের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কতটুকু—? আমাকে যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলে তখন ত চারদিকের লোকের কথা ভাবো নি।"

"তখন আমার কাজের জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী ছিলাম। এখন তুমি আছ, খোকা আছে, খুকী আছে যাদের আমি ছাড়তে পারি নে।"

সাক্ষীর মঞ্চে সতীকে দাঁড় করিয়ে যেন সত্যবান নির্মমভাবে জেরা করে চলেছে। সতীর সত্যিকারের পরিচয় সে যেন ভুলে গেছে—সে

যেন একজন সাধারণ মেয়ে। তাকে সে কোনদিন ভালোবাসে নি, তার অনিচ্ছায় যেন সতীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। কারণ সত্যবান ভাবতে পারে না সংসারের একটা অতি তুচ্ছ গণ্ডীতে যার সমস্ত তৃষ্ণা মিটে গেছে সেই সাধারণ মেয়েকে সে ভালোবাসে। এ মেয়ে লেখাপড়া শিখেছিল শুধু কতকগুলো প্রতিক্রিয়াকে অপযুক্তিতে সমর্থন করবার জন্য। নাৎসী মনোবৃত্তি! মার্ক্সবাদ দিয়ে মার্ক্স-বাদকে হত্যা করবার নাৎসী কৌশল। প্রতিক্রিয়া মানুষের মজ্জাগত বিষ। এক পা এগুলে দশ পা পেছিয়ে পড়া!

"তাদের না ছাড়তে পার, কিন্তু নিজেকে তার জন্য বিলিয়ে দিতে পার না—এদের বুকে ধরে নিজের মৃতু-সাধনা স্ত্রীত্ব বা মাতৃত্ব নয়—পতঙ্গবৃত্তি।"

সতী চুপ করে রইল। সত্যবানের কাছে তা আরো অস্বস্তিকর।

মনে হল তার, সতী রাফাএলের ম্যাডোনার মুখের ভাবটা আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আমাদের সমাজে স্ত্রী বলে যে কতকগুলো জীব তৈরী হয় আত্ম-প্রবঞ্চনা করে তারা কি পরিমাণ খুশি! বিয়েটাই আগাগোড়া বঞ্চনা—আর তাই অশ্লীল। রোমাঁ রোলাঁর কথাটা মনে পড়ে সত্যবানের···Happy marriages are rare···বিয়েতে সুখ প্রকৃতি-বিরোধী। সুরমাদিও বলতেন—তিনিও ভালো করেই জানতেন তা। স্ত্রী স্বামীর নাগাল পায় না, বা স্বামী স্ত্রীর। বিয়ে এদের জীবনে তবু একটা বৃত্ত আঁকতে চায়!

"আমাকে তুমি কি করতে বল?" একটা প্রচণ্ড ব্যথাকেই যেন সতী সামান্য একটু হাসিতে রূপান্তরিত করে দিল।

"আমি বলব আর তাই তুমি পালন করবে!"

"সব সময়ই ত মানুষ জানে না সে কি করবে।"

"যে জানে না এ শতাব্দীর সে অনুপযুক্ত।"

"জানলেও ত ভুল জানতে পারি—আর হয়ত ভুলই জানি।"

এবার সত্যবান চুপ করে গেল। সতীর কাছে কি সে চায় নিজেও সে তা স্পষ্ট পরিষ্কার জানে না। সত্যি সতী যা আছে তার চেয়ে আর বেশি কিছু কি হতে পারে? হতে পারে কি সে বনানীর মত—এত স্বচ্ছ, এত শাণিত? বনানীর বয়সেও কি সতী পেরেছিল এতটা পরিপূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে? তারপর এখন ক্রমেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে সতীর পরিপার্শ্ব হয়ে উঠছে ভারি। সময়ের ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার বালুকণা ভেসে বেড়ায়—তা জমে জমে গড়ে তোলে মানুষের বালুচর। পুরোনো বালুচরে লোকের বসতি হয়ে গেছে, তাকে আর অদ্ভুত লাগে না চোখে—নতুন চরের রূপোলি বালু রোদে চিক্‌চিক্ করে, চোখে নেশা ধরায়।

জানালা দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে রইল সত্যবান। আকাশের তারার দিকে। অজস্র তারায় আর নীহারিকাপুঞ্জে বেড়ে চলেছে স্থানের পরিধি। তার আর শেষ নেই। ঠিক তেম্নি এক-একটি করে মানুষ এসে সত্যবানের জীবনের পরিধিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। জীবন তার অবিরতই ছুটে চলছে বিস্তৃতির পথে। কোথায় যে এর শেষ তা সে জানে না। সত্তার সমগ্রতাকে গুছিয়ে এনে কোনদিন তার রূপ দিতে পারবে কি না তাও সে জানে না। শুধু জানে, সে এক দুর্ণিবার গতির মুখে। চল্লিশ বছরেও সে গতির পথে বাধা আসে নি।

সাত
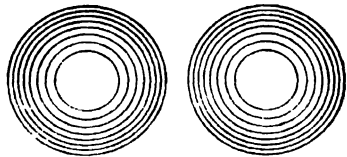
"ভাবতে পারো, সত্যবান, সভ্যতার জয়গান যখন য়ুরোপ করছে, কি করে সেখানে ফ্যাসিজ্‌ম্ এল ? ওকে সভ্যতার সঙ্কট বলো না—সভ্যতার ঊর্দ্ধযাত্রাকে কেউ ঠেকাতে পারে না—ওটা একটা সাময়িক পিছুটান। আমর মনে হয় নিউটনই এক কথায় পৃথিবীর ইতিহাস লিখে গেছে—অ্যাক্‌সন্ আর রিঅ্যাক্‌সন্—শুধু জড়বস্তুই তার ধোঁকায় পড়েছে তা নয়—মানুষ, জাতি, সভ্যতা সবই অ্যাক্‌শন-রিঅ্যাক্‌শনের তৈরী বন্ধুর পথে যাত্রা করেছে।" ইজি চেয়ারের বেতের জালের উপর গাল রেখে সুরমা কথাগুলো যেন আবৃত্তি করে যাচ্ছিল—সত্যবানের মনে হল সে বুঝি মৃত্যুযাত্রী কোনো রোগিনীর কন্‌ফেশ্যন শুনছে। সত্যি আজকাল সুরমাকে রোগিনীর মতই দেখায় যদিও তার কোনো রোগ নেই। তার ক্লান্ত চোখের দিকে চাইলে একেক সময় কষ্টই হয় সত্যবানের, ঠোঁটের পাশের মোনালিসার হাসির অস্পষ্ট রেখাগুলো বার্দ্ধক্যের পুষ্ট রেখা হয়ে ফুটে উঠেছে।

"সত্যবান. মানুষ নিজেকে নিয়ে খুব ক'কদম এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু তারও পিছুটান আছে। সামাজিক জীব হওয়াতেই মানুষের হয়েছে মুস্কিল, নিঃসঙ্গতায় তার ভয়। এগিয়ে যেতে যেতে আশে পাশে সে অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়, যখন তা পায় না তখন থেমে থাকে, পেছিয়েও আসে কখনো।"

"তা যদি আসে তবে বলতে হবে এগুনোটাই তার ভুল হয়েছিল —তার উচিত ছিল থেমে থাকা। সে আত্মসমালোচন করতে শেখে নি।" সত্যবানের মুখের কথাগুলো সুরমার কানেও আশ্চর্য শোনাল। পনেরো বছরের পরিচয়ে সত্যবানকে এতটা সাহহী সুরমা কোনদিন দেখে নি।

"আজকের দিনে তোমরা নিজকে যতই সভ্য মনে করছ, সত্যবান, তোমরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো তোমাদের মধ্যে একটুও বর্বরতা নেই? বর্বর দিনের Taboo-কে তোমরা সযত্নে রক্ষা কর। ১৯৩৮-সনেও তোমরা Sex-Taboo থেকে মুক্ত নও।"

"তার মানে?"

"যার ফলে বিয়ে, monogamy, যৌন-ঈর্ষা, মেয়েদের ভোগের সামগ্রী করে রাখা!" সত্যবান লক্ষ্য করল সুরমার নিস্প্রভ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে।

"আপনি ফ্রয়েডি-আনা করছেন সুরমাদি—" সত্যবান সুরমাকে আগেকার মতই স্তিমিত করে দিতে চাইলে।

"ফ্রয়েড তোমাদের সমাজেরই নির্মম সমালোচক—সে-সমাজ এখনো আসে নি যখন ফ্রয়েড বাতিল হয়ে যাবে। তোমার কথা আমি সব জানি নে সত্যবান, কিন্তু নিজেকে ত আমি জানি। আমি জানি কতটুকু আমার সীমা। কোথায় গিয়ে আমি বাধা পেয়েছি। বাইরের কেউ আমায় বাধা দেয় নি—নিজেই নিজেকে বাধা দিয়েছি।"

"আপনি যদি জানেন যে Taboo-ই আপনাকে বাধা দিচ্ছে, তাকে জয় করতে কিছুই শক্ত নয়।"

"শক্ত হত না—যদি আমার চেয়ে দুর্জয় সাহসী কাউকে পেতাম। তুমি তা নও, রজতও নয়। নিজ হাতে আমি সে বাধাকে ঠেলে দিতে পারতুম না।"

সত্যবান এবার আর ভয় পেলে না, কেমন যেন একটু লজ্জিতই হল। সেই একটা রাত্রির কথা মনে পড়ে তার, সুরমাদি যে তার হাত নিজের হাতের উপর রেখে বলেছিলেন—'কাছে এসো।' সে-সময় সে-দৃশ্যটা সত্যি ভয়ানক মনে হয়েছিল তার, আজ মনে হয় তা কিছুই নয়। তাকে যদি আদিম পশুবৃত্তি ও বলা যায়, মানুষের এত বড় সভ্য জীবনে সে ক'টা বর্বর মুহূর্ত এত কি কলঙ্কময়, এত কি উল্লেখযোগ্য ?

"আগে মনে হত সত্যবান, আমি খুবই সাহসী—যুক্তি-বিচারের পথে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আজ দেখছি তা আমি নই। আমি বিদ্রোহ করতে পারি কিন্তু ক্ষুধা মিটাতে পারি নে, তা করতে হলে যত বড় বিদ্রোহী মনের দরকার তা আমার নেই।"

"হয়ত আপনার জন্যে দ্বিতীয় বিদ্রোহের পরিমণ্ডল তৈরী হয় নি —আপনার যুগ হয়ত ততটুকুই দাবী করে যতটুক আপনি করতে পেরেছেন।" কথাগুলো বলে সত্যবান নিজেও খুশি হল না। কেবল সুরমাদির জীবনেই নয়, নিজের জীবনেও যেন সে একটা ছেদ টেনে দিচ্ছে।

"হতে পারে যে আমাদের মত জীবরা বিদ্রোহীই নয়—সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটা সিঁড়ি মাত্র। যারা সত্যিকারের বিদ্রোহী আসবে তাদের আমরা উপরে যেতে সাহায্য করব।"

কথা বলে সুরমার কথার সুর ভেঙে দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল না সত্যবানের। কেবলি শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল সুরমার কথাগুলো। সুরমার কথা এত ভালো আর কোনদিন মনে হয় নি। জীবনকে তার সত্য রূপে বুঝবার চেষ্টা করেছিল সুরমা—বুঝতে পারে নি—মধ্যপথে তার দৃষ্টি হয়ে গেছে ঘোলাটে। সুরমার ট্র্যাজিডিতে সত্যবানেরও ভয় হয়। জীবন নিয়ে সে-ও ত দুঃসাহসিক অভিযান

শুরু করেছে—শেষ হয়ে গেছে তার মাস্টারমশাইকে জানা, মিস্টার সেনকে জানা, সতীকে জানা—শেষ হল সুরমাদিকেও জানা। এখন বনানী। কিন্তু বনানীকে জানা কি তার হবে—বনানীর সঙ্গে তার এক যুগের ব্যবধান। যুগ দিয়ে অন্যের জীবন সে মেপে দেখাতে চায়, নিজের জীবনের বেলায় তা কি সে কখনও মেপে দেখবার চেষ্টা করবে না? সে না করুক, বনানী ত করতে পারে। দেহের সান্নিধ্যে আসে নি বলে আজও বনানী তা করে নি। কিন্তু এ-ইতিহাস ত আজ নিয়েই শেষ নয়।

"সবচেয়ে ভয় আমার সত্যবান, বনানীকে নিয়ে। হেরিডিটির আইনগুলো আমি মানি নে। মানি মা-বাপের চেহারার ছাপ সন্তানে থাকতে পারে কিন্তু মনের ছাপ কখনও নয়। ছোটবেলা থেকে মা-বাপের সঙ্গ ছেড়ে থাকলে সন্তানের মন সম্পূর্ণ অন্যরকমে তৈরী হতে পারে। কিন্তু বনানী ত আমার কাছেই মানুষ। আমার মনের খর্বতা, আমার জীবনের ট্র্যাজিডি যদি ওর মনের আর জীবনের বাঁক তৈরী করে তোলে তা হলেই হবে সর্বনাশ।"

"কিন্তু আরেকটা কথা ত ভুললে চলবে না। বনানী যুদ্ধোত্তর যুগের মেয়ে—আপনার যেখানে শেষ, ওর সেখানে শুরু—ওর আব-হাওয়া, ওর জগত অন্যরকম।"

"সেই ত আমি চাই, তাই যেন হয়। মা-মেয়েকে যেন একই রকম শাস্তি পেতে না হয় জীবনে।"

ঘরের আবহাওয়ায় একটা বিশ্রী স্তব্ধতা জমে উঠছিল। ওদের থেমে-থেমে চলা কথাগুলো যেন স্তব্ধতারই বুদ্বুদ। এখন আর সুরমা নয় বনানীই এ-বাড়ির প্রাণ। দেওয়ালে নুরজাহানের ছবি রোদে হাওয়ায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে—তার নীচে—দরজার দুপাশের দেওয়ালে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন দেখা যায় লেনিন আর কার্লমার্ক্সের ছবি। নুরজাহানের

মতই সুরমা পশ্চাৎপটে সরে গেছে—বনানীই পাদপ্রদীপের সামনে।
এ-স্তব্ধতা কেবল বনানীর অনুপস্থিতি।

হর্নের আওয়াজের ভূমিকা জানিয়ে একটা মোটর এসে রাস্তায় থামল।

"রজত এসেছে—" একটু উৎসাহ শোনাল সুরমার কণ্ঠে। সত্যবানও জেগে উঠল যেন। রজত একা নয়, সত্যবান অবাক হল, মাস্টারমশাই-ও তার সঙ্গে এসেছেন। অনেকদিন পর মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে দেখা—কিন্তু এ বাড়িতে দেখা হবে সত্যবান যেন তা কল্পনাই করতে পারছিল না। মাস্টারমশাইকে এবাড়ির সঙ্গে পরিচিত দেখে আরো অবাক হল সে। সুরমা তাঁকে 'নিখিলবাবু' বলে সম্বোধন করলেন!

"বুঝলে সত্যবান ট্র্যান্সাওয়্যাণ্টালিজ্‌ম্ সবারই আছে, মাস্টারদের ছাড়া—পর্বতও বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায়—কিন্তু আমরা ঠায় একজায়গায় বসে আছি। কলেজের দালানেরই আমরা সচেতন রূপ; ছাত্ররা দল বেঁধে চলে যায়—অবিরাম তাদের যাওয়া আসা—আমরা শুধু দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকি। কারা এল কারা গেল স্মৃতি তা ধরে রাখতে পারে না—বাঁচি শুধু বর্তমান নিয়ে—"মাস্টার মশাই অনর্গল বলে যাবার ব্যবস্থাই করছিলেন, রজত বাধা দিলে: "সতুকে ও-ট্র্যাজিডির কথা শুনিয়ে লাভ কি মাস্টার মশাই, ও নিজেই তা একদিন আবিষ্কার করবে।"

"না হে ট্র্যাজিডির কথাই ওটা নয়। ওটা হচ্ছে ভূমিকা—এক-দিন তোমাদের মাস্টার ছিলুম, আজ বনানীর মাস্টার, সত্যবানের ছেলেকেও হয়ত একদিন পড়াতে হবে।"

"তাতে কিছু অন্যায় ছিল না নিখিলবাবু—" সুরমা তাড়াতাড়ি বলে ফেলল—"অন্যায় হচ্ছে এই যে আপনাদের শেখানোতে কোনো

পরিবর্তন নেই। শেলীর স্কাইলার্ক সত্যবানও পড়েছে তার নাতিও পড়বে এবং আপনারা সবার কাছে সে-কবিতার একই রকম রস পরিবেশন করবেন।"

"রসের মূর্তি শাশ্বত এ যখন আমাদের ধারণা তখন আপনার অভিযোগে পদার্থ আছে মানি কি করে?" বয়েসের গাম্ভীর্যেই মাস্টার মশাইর কথাগুলো গভীর মনে হল।

"এই রসালাপে আমি নেই--" রজত কেটে পড়তে চাইলে: "সুরমাদি, আজ যখন ফুল-হাউস একটা জোর টিফিনের ব্যবস্থা কর—নইলে আসর ঠিক জমবে না।" অন্দরে ঢুকে পড়ল রজত।

অনেক বছর আগেকার মত হাসতে চাইলে সুরমা: "বসো সত্যবান, নিখিলবাবু বসুন—ওটা শুধু রজতেরই ইচ্ছে নয়, আমারও ইচ্ছে—"

সত্যবান রজতকেই লক্ষ্য করছিল, ভীরু-ভীরু ভাবটা ওর এখনও গেল না। বিয়ে ও করে নি, হয়ত করবেও না কিন্তু সুরমাদির সঙ্গে পারলে না ও সম্বন্ধটা পরিষ্কার করতে। বাইরের ছেলেমানষি ব্যবহার এখন যে আর ওকে মানায় না নিজেও হয়ত তা বোঝে; তবু ও নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে চলেছে। আর সুরমাদি? তাঁর অবস্থা ত তাঁর মুখেই শুনলে সত্যবান।

"রস সম্বন্ধে কথাটা বলে পার পেলুম আমার নতুন ছাত্রীটি নেই বলে, রস যে শাশ্বত নয় বনানী জিওমেটি র থিয়োরেম্-এর মত প্রমাণ করে Q. E. D. বলে দেয়।" একটা স্নেহাতুর হাসির ভাব দেখালেন মাস্টার মশাই।

সত্যবান তর্কের আবহাওয়ায় জমাট হতে চাইল না: "আপনাকে এখানে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, মাস্টার মশাই।"

"বনানীর আকর্ষণ!" কথাটা নিজের কানে যেতেই মাস্টার

মশাই অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠলেন : "সাংঘাতিক কুতার্কিক মেয়ে ত—কাজেই বক্তৃতাবাগীশ আকর্ষিত হয়েছে !"

সহজ হতে চাইলেও মাস্টার মশাইকে সং-এর মতই মনে হল সত্যবানের কাছে। ভালো লাগল না তাঁর কথা বলবার ধরন। নিজেকে একটু স্মার্টও যেন তিনি দেখাতে চাচ্ছেন, যা এ-বয়েসে হাস্যকরই মনে হয়। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল, তাঁর মুখে বনানীর কথা শুনে। বনানীকে চিনতে হবে কি মাস্টারমশাই-এর সার্টিফিকেটে ?

"এসো—এসো—তোমার অপেক্ষায়ই বসে আছি—" মাস্টার মশাই-এর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পেছন ফিরে ছিল সত্যবান তাই প্রথমটায় বুঝতে পারল না মাস্টার মশাই কাকে এমন অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

"মাস্টার মশাই !—বাঃ আপনিও !" একটা চেয়ারের পিঠে ধরে চমৎকার ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল বনানী। একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে, তাতে তার মুখে মাধুর্যই এনেছে। প্ল্যাটোর সৌন্দর্যজ্ঞান হিসেবে বনানীকে আদর্শ সুন্দর বলা যায়—চোখে মুখে তার সত্যি জ্যামিতিক সৌন্দর্য আছে—যেখানে সরলরেখা হওয়া উচিত সেখানে নিখুঁত সরলরেখা, বাঁকারেখার বাঁকগুলোও নিখুঁত। তাই ক্লান্ত না দেখালে বনানীকে একটু উগ্রই মনে হয়।

"বোসো" চোখের দৃষ্টিতে সত্যবানও উজ্জ্বল হয়ে উঠল খানিকটা : "মাস্টার মশাই যে তোমারও মাস্টার মশাই আজই আমি প্রথম জানলুম।"

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল বনানী : "রোমান্টিসজ্‌ম্‌-এর পাণ্ডাদের ত সব যুগেই খোঁচাখুঁচি করে বেড়ানো চাই।"

চোখ মিটমিট করে মাস্টার মশাই বললেন : "বলেছিলুম কিনা সত্যবান, বনানী আমাকে দেখলেই ফণিনী হয়ে ওঠে।"

"বাঘিনী বললেই ভালো করতেন—কেন না আপনাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ।"

"আপনাদের মানে ?" সত্যবান একটু কৌতুক অনুভব করলে।

"রোমান্টিকদের—"

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মাস্টার মশাই বললেন : "রোমান্টিক-দেরই একদম বাতিল করে দিতে চাও ? রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ না থাকলে একটা পোড়া-কাঠ জীবন নিয়ে কি কাজ ?

"অলস স্বপ্ন দেখার চাইতে করবার মত ঢের বড় কাজ জীবনে আছে ; রোমান্টিসিজ্‌ম্‌কে দেবতার আসন দিয়ে তার চারপাশে জীবন ভোর হৈ-হৈ করে কীর্তন করে মানুষের আপনারা কি সুবিধেটা করছেন বলুন ত !"

"মনের মৃদু অনুভূতিগুলো দিয়ে তুমি জাল বুনতে না পারো বনানী কিন্তু তা বলে তাদের সমূলে নাশ করতে পারো না। আর তারা যদি নষ্টই না হয়, মন তাদের নিয়ে জাল না বুনুক, মিহি সূতো তৈরী করে চলবে।"

"তা সময় সময় করুক না—" সত্যবান তার নিজের যুক্তি নিয়ে এল : "কিন্তু জালের আড়ালে লেডি অব্‌ শ্যালট হতে আমরা রাজী নই।"

বনানী ভীষণ খুশি হয়ে উঠল সত্যবানের কথায় : "দ্যাট্‌স ইট্‌।" খুশি হল এইজন্যে যে সত্যবানকেও সে একরকম রোমান্টিকই ভাবত—তার এই পরিবর্তনের মূলে বনানী ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না। থিসিসের বিষয় নিয়ে বনানীর সঙ্গে অনেকদিন তর্ক হয়েছে সত্যবানের। জমিতে মূলধন খাটাবার প্রস্তাবে জমিদারের স্বার্থ উচ্ছেদ করেও সত্যবান স্টেট আর মূলধনীদের স্বার্থ ই বড় করে দেখাতে চায়—চাষীর পক্ষ নিয়ে বনানী অনেক যুক্তি দেখিয়েছে,

তর্ক করেছে আক্রমণ করেছে, রাগ করেছে। বনানী জানে এখন আর সত্যবান তার থিসিসের মতামত সমর্থন করে না। এই জয়ের আনন্দ বনানীর খুব বেশি।

"বেশ!" মাস্টার মশাইর যুক্তির ভাণ্ডার এখনও খালি হয়ে যায় নি: "পার্সোন্যাল ব্যাপারে Once in a blue-moon তোমরা না হয় একটু রোমান্টিক হলে—কিন্তু আদর্শে পৌঁছুবার জন্যে যে যাত্রা শুরু করবে পথে পথে আদর্শেরই নাম জপে তা কি রোমান্টিসিজ্‌ম্ নয়?"

" 'ম্যয় স্থনে হরি আওয়ন কি আওয়াজ' বলে মীরার মত এলো-চুলে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া কিম্বা 'বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে' বলে রবিবাবুর মত কবিতা লিখে অপেক্ষা করাকে আপনি তা-ই বলতে পারেন কিন্তু আমরা চাই পৃথিবীর রং মুছে ফেলে অন্য রং আনতে, অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পাল্টে দিতে, তার জন্য যে শারীরিক ও মানসিক শ্রম করতে হয় তাকে যদি আপনি রোমান্টিসিজ্‌ম্ বলে খুশি হতে চান হতে পারেন।" বনানীর ধারালো মুখে কতকগুলো ধারালো রেখা খেলে গেল।

"পরম সত্তার সঙ্গে মিলন-আকাঙ্ক্ষা জীবনের কর্তব্য নয় বলতে চাও?"

"পরম সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে যে প্রশ্নের পাহাড় জমে উঠেছে সে খবর কি আপনি রাখেন না মাস্টার মশাই?" সত্যবান উদাসভাবে সীলিং-এর দিকে কথাগুলো ছেড়ে দিলে।

"প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণের প্রলেপ দেবার জন্যই পরমসত্তার প্রয়োজন, আমরা পৃথিবীর নিজস্ব প্রাণকে খুঁজে পেয়েছি। কাজেই সেই কল্পিত পরম সত্তার প্রয়োজনও আজ ফুরিয়ে গেছে।" বনানী বললে।

মাস্টার মশাই হাসলেন। ফাঁপা হাসি। বোঝা গেল তিনি আর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না—আর খুঁজে পেলেও তার পাকে তিনি জড়িয়ে পড়বেন। কোনঠাসা হতে তিনি রাজী নন—মধ্যপথেই তর্ক ভেঙে দেওয়া ভালো, এ তাঁর তার্কিক জীবনের অভিজ্ঞতা, তাতে ভবিষ্যৎ খোলা থাকে।

সত্যবান বুঝতে পারল এ পরাজয়ের হাসি। কিন্তু পরাজয়েও উৎসাহের আগুন মাস্টার মশাই একেবারে নিভিয়ে দেন না, ওটাতে ছাইচাপা দিয়ে রাখেন। খুব কঠিন তার্কিকের লক্ষণ। কিন্তু মাস্টার মশাইকে আজ শুধু তার্কিক ভেবে নিতে সত্যবানের ইচ্ছে হল না। তাঁর মন থেকে স্বতন্ত্র কাউকে দেখলেই তিনি তার দিকে এগিয়ে যান—শুধু তর্ক করতে নয়, তাকে অভিভূত করতে, আচ্ছন্ন করতে। নিজের আয়ত্তে একবার তাকে আনতে পারলে যা খুশি তাকে নিয়ে তিনি করতে পারেন। অক্টোপাশের সাঁড়াশির মত তাঁর এ আক্রমণ। সাঁড়াশিগুলোকে তিনি এবার বনানীর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। অসম্পূর্ণ জীবনের অত্যাচারে এখন হয়ত তিনি সম্পূর্ণতার তৃপ্তি পাবার জন্য ব্যাকুল—হয়ত তাই তাঁর এ অভিযান। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল বনানী: "মা কোথায়? বাড়ি নেই?"

"হাঁ—ভেতরে আছেন, আমাদের ভোজন-ব্যবস্থায় ব্যস্ত—" বললেন মাস্টার মশাই।

"আমিও ভেতর থেকে আসছি" বনানী সত্যবানের দিকে চেয়ে সুন্দর করে একটু হাসলে: "সারাটা দিন চাঁদা-আদায়ে ঘুরতে হয়েছে —তিনটা কারখানায় স্ট্রাইক চলেছে একসঙ্গে।"

আবার সেই মাস্টার আর তাঁর কক্ষ-মুক্ত প্রাক্তন ছাত্র। তবু মাস্টার মশাই মাস্টারি করতে চাইলেন: "নতুনদের খাতায় তুমিও গিয়ে নাম লিখিয়েছ বুঝি?"

"জীবনে ত এমন শিক্ষা কিছু পাই নি যা দিয়ে নতুনকে প্রতিরোধ করা যায়।" মাস্টার মশাইকে একটা সূক্ষ্ম আঘাত দিতে চেষ্টা করলে সত্যবান।

"স্রোতের সঙ্গে গা ভাসাতে যদি চাও, সত্যবান, অনন্তকাল ভেসে যেতে পারবে। স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকাই শক্ত, সে-শক্তি সবার নেই।"

"পুরোনো হাওয়ার সবচেয়ে বড় দোষ কি জানেন, মাস্টার মশাই, সে ভুলে যায় সে-ও যে একদিন নতুন ছিল, তখনকার পুরোনোর কাছে তারও যে মার খেতে হয়েছে—তাই নতুনের Struggle for existence-কে সে অনুকম্পা দেখায়।"

রজত এল—পাঞ্জাবীটা উধাও হয়েছে—শুধু গেঞ্জী গায়ে: "তর্কটা জোর চলছে ত? তোমাদের ব্যবস্থাও প্রায় হয়ে এল।"

"আমাদের ত প্রায় যাবার সময় হল, তুই দেখছি কায়েমী হয়ে বসবার পোশাক নিয়েছিস।"

"নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণটাও আছে কি না আমার!"

"ওঃ" সত্যবান থেমে গেল। বুঝতে পারল সে, সুরমাদির সঙ্গে রজত এখনও একটা দূরত্ব ঘোষণা করে চলতে চায়—রাত্রিতে এখানে খাওয়াটা রজতেরই ইচ্ছায় হচ্ছে, তাতে কেউ বাধা দেবার বা আপত্তি করবার নেই। তাকে নিমন্ত্রণ বলে ঘোষণা করে রজত সুরমাদির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার উপর একটা পর্দা টেনে দেবার চেষ্টা করছে।

"সুরমাদি ন'টার শো-তে 'অ্যানা ক্যারেনিনা' দেখতে যাবেন বলছিলেন—যাবি না কি তুই সতু, সিনেমার নামেই ত মাস্টার মশাই কানে আঙ্গুল দেন।"

অন্যমনস্ক অবস্থাতেই মাস্টার মশাই হাসলেন। সত্যবান বললে : "ওটা দেখেছি! তুই দেখিস নি এখনও?"

"দেখেছি একবার—সুরমাদি বললেন—মানে ওর সঙ্গে ত কারু যাওয়া চাই!"

"বনানী যাবে না?"

"তার নাকি কাজ আছে—একগাদা লেখাপড়া—কোনো মীটিং-ফিটিং-এর হবে হয়ত।"

সত্যবান লক্ষ্য করল মাস্টার মশাইকে ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে, ছোট ছেলের হাত থেকে একটা খেলনা কেড়ে নিলে যেম্নি দেখায়। তাঁকে একটু চাঙ্গা করে তোলা দরকার : "রজত কিন্তু, মাস্টার মশাই, আপনার সত্যিকারের সাকরেদ!"

"কি করে?" নিস্পৃহের মতই মাস্টার মশাই চোখ তুললেন।

"আপনার মতই ও ব্যাচেলার থেকে গেল।"

"ওর এখনও সময় হয় নি!"

"আপনি কি বলছেন, চল্লিশ ধরতে দু তিন বছর মাত্র বাকি।"

"তাতে কি হল? বিলিতি শরীর, বিলিতি ব্যবসা—যৌবনের বয়সটা-ও বিলিতিই হবে।"

"কি দরকার আছে বলুন ত মাস্টার মশাই ও হ্যাঙ্গামায়? এম্নিতেই ত বেশ আছি, দিব্যি একা।"

"বয়েস আছে বলে বেশ আছ মনে হয় রজত, অন্তত সত্যিকথার অপলাপ না করে আমি বলতে পারি নে বেশ আছি।"

সত্যবান হেসে উঠল। রজত একটু অবাকই হল মাস্টার মশাইর কথায়। মাস্টার মশাই চুপ করে গেলেন। এদের কাছে নিজেকে আর অনাবৃত করে লাভ নেই।

চায়ের সরঞ্জাম আর প্রচুর খাদ্য নিয়ে উপস্থিত হল নিমু। দোকানের খাবার আর ফল-ফলারি। সত্যবান জানে ফলটা রজতের যোজনা—ভিটামিন-ভক্ত সে।

রজত নিমুর সঙ্গে গিয়ে জুটলে: "বাবা ট্রে-টা খালি করে ওগুলো টেবিলে ওম্নি রেখে যাও—তোমাকে আর সাজাতে হবে না—তারপর চা-দুধ আর চিনিটা নিয়ে এস।"

সুরমা এল, বনানীও। সুরমার চেহারায় বিকেলবেলাকার সেই ক্লান্তিটা আর ছিল না। দেখে সত্যবানের ভালো লাগল, একটু কৃতজ্ঞতাই যেন বোধ করল রজতের প্রতি। যতটা ম্লান দেখাচ্ছিল তাকে তা শুধু বনানী পাশে আছে বলে। সাধারণ একটা শাড়িতেও বনানীকে চমৎকার দেখায়।

মেয়েদের সামনে গম্ভীর হয়ে থাকাটা ভালো মানায় না দেখে মাস্টার মশাই আবার একটু ছটফটে হতে চাইলেন: "মিসেস রায়, আজ হোস্টেসের কাজটা বনানীই করুক!"

"নিশ্চয়, ও-ই করবে।" অভ্যাগতের মতই সুরমা একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল।

"হোস্টেসের কাজ মানে চা ঢেলে দেওয়া ত? এটা ত খুব পরিশ্রমের কাজ নয় তাছাড়া চিনি বা দুধ কম খাওয়া একেক জনের একেক রকম—কাজেই যাঁর যা চা তিনি সেটুকু করে নিলেই সবদিক থেকে ভালো।"

অনায়াসে কথাটা বলে ফেলবার ধরনটা সত্যবানের বেশ ভালো লাগল: "বেশত! মুসলমানদের মধ্যে খাওয়ার এ পদ্ধতিটা আছে —আর এটা খুব economic।"

মাস্টার মশাই বললেন: "ইস্লামিক কালচারটা হিঁদুর হেঁসেলে আর না ঢোকালেও পারো সত্যবান।"

"মাস্টার মশাই কি শেষটায় হিঁদুসভার শরণ নিয়েছেন?" রজত ব্যাপারটাকে একটু উস্কে দিতে চাইল।

"সে তর্ক পরে হবে।" সুরমা একটু উদ্বিগ্ন হল: "বনানী, তোমারই চা করা উচিত!"

"চা আমি করছি। ওটা আমার একটা suggestion মাত্র।" বনানী চটপট বলে ফেললে।

"ইস্লামিক কালচারে যেটুকু সত্যিকারের ভালো তা আমাদের গ্রহণ করতে বাধাটা কি—সেটা হেঁসেলেই হোক আর জীবনেই হোক?" সত্যবান মাস্টার মশাইকে প্রশ্ন করলে।

কাপে চা ঢালতে ঢালতে বনানী জুড়ে দিলে: "তাছাড়া জাতি হিসেবে রক্তের বা কালচারের পবিত্রতা অতীতেও আমরা রক্ষা করি নি আজ এমন হঠাৎ সংরক্ষণী সভার মেম্বর হয়ে উঠলে চলবে কেন?"

সামান্য একটা কথায় যে এত আগুন জ্বলে উঠতে পারে মাস্টার মশাই তা কল্পনাও করেন নি। তবু আগুন যখন জ্বলেছেই তাতে তাঁকে পা দিতেই হল: "হিন্দু মুসলমান তাদের পৃথক কালচার অনুসরণ করে ভারতবর্ষে নিরাপদে পাশাপাশি বাস করতে পারে, মেশামেশির এত প্রয়োজন বা কি?"

"জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির ঐক্য সবচেয়ে গোড়ার কথা।" সত্যবান সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করল—কারণ সে জানে তারপরও তার সূত্রধর বনানী আছে।

"জাতীয় জীবনই বা কেন? জাতীয় জীবনের শৃঙ্খলা কি পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা মিটাতে পারে? তাই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মধ্যে চাই সংস্কৃতির আন্তরিক আদানপ্রদান। যখন পৃথিবী চলছে সেদিকে আমরা তখন সাম্প্রদায়িকতার বদ্ধঘরে নিজেদের বন্দী করতে যাচ্ছি! যাক আপনাদের চা তৈরী, কাজেই এখন ট্রুস্।"

সুরমা চা পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বনানী নিজের কাপটা নিজেই তুলে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিলে তারপর সত্যবানের দিকে চেয়ে বললে: "কমরেড কথাটায় হয়ত আপনার আপত্তি হবে তাছাড়া আপনি সত্যিকারের তা ননও—আর আপনার নামের শেষে একটা মামুলি মামা যোগ করে ডাকতেও আমার ভালো লাগে না—তারচেয়ে যদি সত্যবানদা বলি আপনার কোনো আপত্তি আছে?"

সবাই হেসে উঠল, সুরমাও। সত্যবান বললে: "কিছুমাত্র নয়।"

"আরেকটা অনুরোধ আছে।"

"বল।"

"আপনি ত বুর্জোয়া ইকনমিক্সের পাকা ওস্তাদ—ইকনমিক্সের সূত্রগুলো ঠিক আমি ধরতে পারি নে। মার্ক্সের ক্যাপিটেলটা আমাকে পড়িয়ে দেবেন?"

"অবিশ্যি তার আগে আমারও ওটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। আমাদের যুগে ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে' মার্ক্স ধামাচাপাই ছিল।"

"তা আমি জানি নে—আপনার কাছে আমি পড়ব।"

মনে হল মাস্টার মশাই নিবিড়ভাবে চায়ের ঘ্রাণ নিচ্ছেন। তিনি ভাবছিলেন, হয়ত স্বপ্নই দেখছিলেন, বনানীর একবছর আগেকার এমনি একটা কথা। শেলী পড়বার জন্য ঠিক এমনি আব্দার বনানী তাঁর কাছে করেছিল। সেই সূত্রেই বনানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, এ বাড়িতে তাঁর আসা। বনানীর কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে—এমনি হয়ত সবারই সবার প্রয়োজন ফুরায়—তিনিই মাত্র জীবনে একই জায়গায় রয়ে গেলেন। একই জায়গায় থাকবার যন্ত্রণা তিনি মনে মনে আজকাল অনুভব করেন—এগিয়েও যেতে চান মাঝে মাঝে—কিন্তু

সেই এগুনোয় দৃঢ়তা নেই। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর কাছে বনানীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু ক্রমেই বনানী দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে—যখন তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন বনানী তখন তাঁর হাতের নাগালের বাইরে—যখন হাঁটতে শুরু করেছেন, বনানী তখন ছুটে পালাচ্ছে। বয়েসকে ভুলে থেকে জোরে পা চালাবার উপায় তাঁর নেই। যখন বয়েস ছিল, মনে পড়ে, ইণ্ডিভিজুয়ালিজ্‌মের পাঁকে তিনি ক্রমাগতই ডুবে গেছেন—অবিশ্যি তখন মনে হত যে ক্রমেই তার উর্ধ্বগতি হচ্ছে, মেয়েরা নীচুস্তরের জীব, তাদের সাহচর্য বুদ্ধিশীলের কাম্য নয়। আজ মনে হচ্ছে তার উর্ধ্বযাত্রা একটা বঞ্চনা মাত্র, আসলে অস্বাস্থ্যকর পাঁকেই তিনি ডুবছিলেন।

"চা এল, কিন্তু নিখিলবাবুর উত্তেজনা কোথায়?" সুরমার কাছেও তার গাম্ভীর্য ধরা পড়ে গেছে।

"বনানীর কথার উত্তাপে রিলেভিটির আইন অনুসারে মাস্টার মশাইর কথাগুলো আইস্‌ক্রীম হয়ে গেছে।" রজত বললে।

"ঠাণ্ডাও বটে নরমও বটে—" মাস্টার মশাই টেনে-টেনে শুরু করলেন: "কিন্তু আইস্‌ক্রীম ঠিক বলা যায় না। আইস্‌ক্রীমটা সুস্বাদু, আমার কথায় ছাই স্বাদই নেই।"

"এটা কি মাস্টার মশাইর নিজের আবিষ্কার?" সত্যবান জিজ্ঞাসা করলে।

"নিজের বই কি!" মাস্টার মশাই সুরমার দিকে চেয়ে বললেন, যেন বাদীর উকীল বিবাদীর উকীলের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

"কিন্তু সাহিত্যের মাস্টারদের ত ধারণা তাঁরা সব কিছু সম্বন্ধেই মুখরোচক কথা বলতে পারেন।" সুরমার কাছেও মাস্টার মশাই আশ্রয় পেলেন না।

"সাহিত্যের কেন? ইকনমিক্সের মাস্টাররাও কম যায় কিসে?

কি বলিস সতু?" রজত সত্যবানের উপরও চোটটা চাড়িয়ে দিতে চাইলে, মাস্টার মশাইর কোণঠাসা অবস্থায় তার দয়া হচ্ছিল।

"এবার কিন্তু, মাস্টার মশাই, আমি আর আপনি ইউনাইটেড ফ্রণ্ট।" সত্যবান শেষ চুমুক দিয়ে তাড়াতাড়ি চা-র কাপটা নামিয়ে রাখল।

কিন্তু মাস্টার মশাই মনে মনে সত্যবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে ফেলেছেন, বাইরেও যেন তা জানাজানি হয়ে গেছে —তাই সত্যবানের সঙ্গে আর তিনি হেসে কথা বলতে পারেন না। অথচ বাইরে যে এখনো কেউ তা বুঝতে পারে নি আর চুপ করে থাকলেই যে সবার মনে একটা না একটা সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে সে-খেয়ালই তাঁর ছিল না।

বিশ্রীভাবে হঠাৎ উঠে পড়লেন মাস্টার মশাই: "রজত, তোমরা বোধ হয় সিনেমায় যাচ্ছ? আচ্ছা—চলি মিসেস রায়।"

ব্যাপারটা এত অপ্রত্যাশিত যে সুরমা ন্যর্ভাস হয়েই ঘাড় নেড়ে ফেললে। জোর করেই বনানীর দিকে না চেয়ে মাস্টার মশাই বেরিয়ে গেলেন।

"কি করবি সতু বল্! ব্যাচেলার মানুষ আমরা—আমাদের রাগ একটু বেশি।" ঘরের আবহাওয়াটাকে রজত গম্ভীর হতে দিলে না।

"কিন্তু মাস্টার মশাইর রাগ আর হিপোপটেমাসের জ্বর ত একই রকম।" সত্যবানের মনে একটা সন্দেহ সত্য হয়ে উঁকি দিচ্ছে।

"এম্নিতেই ত মানুষের মধ্যে ডিভিশন সাবডিভিশনের অন্ত নেই" বনানী রজতের দিকে চাইল: "আপনি আবার পার্থক্যের এক নতুন সূত্র জুটালেন—ব্যাচেলার মানুষ আর ম্যারেড মানুষ।"

"এ তোমার মার্ক্স-সাহেবের এলাকা নয়—এটা খাঁটি বায়োলজির তর্ক।"

"আপনিও ত ব্যাচেলার—করুন ত রাগ।"

"রাগ করতে পারি নে মনে করেছ ?"

রজত সবাইকে হাসিয়ে ফেললে। হাসির শেষে সত্যবান বললে: "সুরমাদি, আমিও তবে পালাই—রেগে নয়—হাসিমুখেই। ছবির সময়ও আপনাদের হয়ে এল।"

"বারে—মা-রা সিনেমায় যাচ্ছেন—আমি বুঝি বাড়ি পাহারা দোব ?"

"তুই-ও চল না" সুরমা বললে: "তখন যে বললি তোর পড়াশুনো আছে।"

"ওহো—ভুলেই গিয়েছিলুম। এই সত্যবানদা—খবর্দার—আপনি পালাতে পারবেন না—নিয়ে আসছি আমি বইটা—'ক্যাপিটেল'।" বই আনতে ছুটল বনানী।

"দেখুন ত সুরমাদি—আমি এখন কার্ল মার্ক্স পড়াই কি করে ?"

"কেন বাবা, কথায় কথায় ত মার্ক্সের বুলি ঝাড়ো আজকাল!" রজত চোখেমুখে পুঁজিবাদীর আক্রোশ ফুটাতে চাইলে।

"তুমি পারবে না—ওকি একটা কথা হল ?" সুরমার মুখে একটা সুন্দর স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল যা সত্যবান আর কোনদিন দেখে নি।

আট
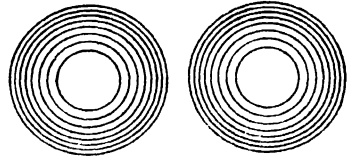
মনে মনে বনানীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কলেজ থেকে ফিরছিল সত্যবান। আজকাল ক্লাশ করতে যাওয়া আর কার্ল মার্ক্সের সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করা সমান কথা। পুঁজিবাদ সম্বন্ধে মার্ক্সের আলোচনার সঙ্গে ওয়াকিবহাল না থাকলে সাবেক পুঁজি নিয়ে কোনো প্রফেসরের সাধ্য নেই সম্ভ্রম বাঁচিয়ে ক্লাশ করে আসা। সত্যবান সম্প্রতি ইজ্জত রক্ষা করে আসছে বনানীকে 'ক্যাপিটেল' পড়িয়েছিল বলে।

বাড়িতে ঢোকবার আগেও সত্যবান ভাবতে পারে নি তার কৃতজ্ঞতার পাত্রী সশরীরে তার বাড়িতেই উপস্থিত থাকবে। একটু ক্যাকাসে হয়ে গিয়ে সত্যবান লক্ষ্য করলে সতী আর বনানী আলাপে জমে গেছে।

"আমি অবাঞ্ছিত আগন্তুক হব না ত?" সভ্যতা-দুরস্ত কথা মুখে নিয়ে সত্যবান সেটির একটা কুশনে জায়গা করে নিলে।

সতী এমন করে হাসল যেন বনানীর উপর এ-কথার প্রতিক্রিয়ার শুভাশুভ তারই প্রাপ্য আর তার জন্য সে অপেক্ষাও করে আছে।

বনানী কলরব করে উঠল: "মেয়েদের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করা আপনাদের একটা জন্মগত বৃত্তি। ভয় নেই, আমাদের আলাপে এসে ঢুকলে আপনার জাত যাবে না।"

"যা-ই বল বনানী—তুমি কিন্তু ঝগড়াটে।"

"পলিমিক্স মার্ক্সইজ্‌মেরই অন্তর্গত।"

"মানলুম। কিন্তু তুমি একাই নাকি? সুরমাদি আসেন নি?"

"ও কলেজ পালিয়ে এসেছে—"সতী যেন চোর ধরিয়ে দিলে।

"মা যেন আজকাল কী রকম হয়ে গেছেন—কোথাও বেরোন না—মুখ বুঁজে সারাটা দিন বাড়ি বসে থাকবেন।"

সত্যবান সুরমাকে আর টেনে আনতে চাইল না। বললে: "কলেজ পালিয়ে লেবার এরিয়াতে বা বক্তৃতামঞ্চে না গিয়ে এখানে যে?"

"লেবার এরিয়াতে আমি যাই কখনো?"

"সে তুমিই জানো।"

"কখ্‌খনো না।"

"Marxism is a guide to action—তা জানো? গলাবাজিতে মার্ক্সিস্ট হয়ে লাভ নেই।"

"ঢের লাভ আছে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ওটা গাইড হলেও ঢের লাভ। একটা পচা, ছ্যাৎলা-পড়া জীবন নিয়ে ধুঁকতে হয় না।"

"বেশ, তুমি এসে ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে" সতী আবহাওয়াটায় একটু হাঁপিয়েই উঠেছিল: "বেচারী এসে অবধি একটা কিছু মুখে দিলে না পর্যন্ত—!"

"আমি আসবার আগেও ত মুখে দিতে পারত!"

"বা রে আমি যেন মুখে কিছু দিতেই এসেছি আর কি! পণ্ডিত-মানুষের লাইব্রেরীটা দেখতে এলুম।"

"বই-এর আলমারী ত খোলা দেখছি নে!"

"ও আর খুলতে হয় না। কাঁচ যে স্বচ্ছ পদার্থ এ জ্ঞানও কি আপনার নেই?"

"তা আছে। কিন্তু বই-এর নাম দেখা হলেই যে বই দেখা হয় সে জ্ঞান আমার ছিল না।" সতী পশ্চাৎপটে পড়ে যাচ্ছে। সে এগিয়ে এল: "বনানী, তুমি চা না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবে না, বলে যাচ্ছি।"

"চা না খেয়ে যাবে কি!" সত্যবানও প্রতিধ্বনি করল।

সতী চলে যেতেই কেমন অদ্ভুত নরম হয়ে এল যেন বনানীর মুখ। সত্যবান নিবিড়ভাবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারই পরিবারের স্থূল পরিমণ্ডলে বনানীর সঙ্গে মুখোমুখি সে বসে থাকবে—এ-কল্পনা সত্যবান কখনো করে নি। বনানীকেও যেন এখানে মানায় না—বড় বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। নিত্যকার তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে যে সত্তা সেখানেই একমাত্র সত্যবানের সহযাত্রিণী হতে পারে বনানী।

"খোকা কোথায়?" বনানীর প্রশ্নও অদ্ভুত।

একটা ছায়া যেন ঘনিয়ে এল সত্যবানের মুখের উপর: "স্কুল থেকে ফেরে নি হয়ত—"

"খুকীটা ভারি সুন্দর আর দুষ্টু হয়েছে দেখতে—ঘুমিয়ে আছে—"

বনানীর সামনে এখানকার স্মৃতিতে জাগতে চায় না সত্যবান। তার চেয়ে তর্ক ভালো। কোনো নীরস জটিল বিষয় নিয়ে হোক তা-ও ভালো। সত্যবান হাত-পায়ে অস্বস্তি জানালে।

এবার আরো অদ্ভুত প্রশ্ন করলে বনানী: "মানুষের যৌনবৃত্তির যে রূপান্তর হয়, আপনি মানেন সত্যবানদা?"

কথাটাতে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রলেপ লেগে আছে কিনা সত্যবান অনুসন্ধান করতে চাইল না, নিছক তর্কের ছাঁচে ওটাকে টেনে নিয়ে শুরু করলে: "দেহ ছাড়াও মানুষ যখন মন নামক

একটি সম্পত্তির মালিক—আর এ মন যখন যৌনবৃত্তিকে তার দৈহিক বেষ্টনী থেকে বহুদূরে টেনে এনেছে তখন যৌনবৃত্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

"ক্ষিদে পাওয়ার ইভলিউশন হয়েছে ?"

"না। কিন্তু তাই বলে যৌনবৃত্তির উপর মানুষের মনের আধিপত্যকে ত অস্বীকার করা যায় না।"

"আপনি যাকে আধিপত্য বলছেন তাকে ত স্বেচ্ছাচারিতাও বলা যায়। গোড়ায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে অনুভূতিটা চরম আনন্দ দিয়েছে, অবিরত সেই আনন্দ পাবার লোভে মানুষের মন সময়ের সীমাকে ভেঙে দিয়েছে বলে অনুমান করা কি অন্যায় ? এ কি ইভলিউশন ?"

"নিশ্চয়। Evolution means Progress—Progress-এর মানে Positive value লাভ করা।"

"একটা মহৎ কাজে যৌনবৃত্তিকে এঞ্জিনের স্টিমের মত ব্যবহার করা আমার মাথায় কিছুতেই আসে না, সত্যবানদা। মনে হয় তাতে মানুষের বিকৃতি হবে। তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য, শক্তি সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তোমার মতে যৌনবৃত্তিকে নিয়ে কি করতে হবে ?"

"ওকে প্রাধান্য দেওয়াতেও ক্ষতি চেপে যাওয়াতেও ক্ষতি। পুরুষ-নারীর মধ্যে শুধু এ সম্বন্ধই আছে এ যেমন আমি ভাবতে পারি নে তেম্নি পুরুষ-নারীর মেলামেশার ভেতর এ-বৃত্তিটাকে সতর্ক পাহারা দিয়ে রাখতে হবে তা-ও আমি মানতে রাজী নই।"

সত্যবান বনানীর চোখের দিকে চেয়ে রইল। স্থির তার চোখ—বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বল্‌জ্বল্ করছে না। এ যেন তার মেধার বক্তব্য নয়, রক্তের নিবেদন।

অভিভূতের মতই একসময় সত্যবান বললে : "তুমি ত অন্যায় কিছুই বলছ না।"

বনানী যেন সত্যবানের কথায় কানই দেয় নি : "ওটার Sublimation হতে পারে শুধু প্রেমে। প্রেম বলতে কিন্তু শুধু emotional companionship-ই নয়, Intellectual companionship-ও বোঝায়। সে-প্রেমের স্থায়িত্ব নির্ভর করে একমাত্র নারী-পুরুষের মন ও মেধা এক সুরে বাঁধা থাকলে।"

সত্যবান এ-কথা জানে না এমন নয় আর সে জানে তার নিজের জীবন থেকেই। মনে হল সে যেন বুদ্ধের কোনো সহচর-শিষ্য, বুদ্ধের উপদেশ কান পেতে শুনে নিজেকে আবিষ্কার করে চলেছে।

"যৌনবৃত্তিকে এতদূর এনে পৌছুনো কি কম কথা ? আর এই তার স্বাভাবিক গতি-পথ। তার স্রোতকে অন্যপথে চালিয়ে নেবার দুর্বুদ্ধি কেন হয় ? তীক্ষ্ণ সমাজ-বোধ থেকেই মানুষ মহৎ কাজ করতে পারে, যৌনবোধকে দিয়ে দাস্যবৃত্তি করবার কি দরকার ?"

"এত সাবধানী হয়ে কি মানুষের মন কাজ করে বনানী—তার আবেগ আর অনুভূতির রাজ্যটা ভীষণ ঘোলাটে !"

"আমার ত মনে হয়, সত্যবানদা, সেখানকার নৈরাজ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করাই জড়বাদী দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য।"

"মানুষ তেমন হতে পারলে জীবনের অনেক ট্র্যাজিডি তার বেঁচে যায়।"

"আমি মানুষের তেমন ভবিষ্যতেরই স্বপ্ন দেখি।"

সে-স্বপ্ন সত্যবানেরও আছে। প্রমেথিউসের মত মাটির সঙ্গে তার দেহ শিকলে বাঁধা—কিন্তু হৃদপিণ্ডে সে অনবরতই নভোচারী ঈগলের স্পর্শ পাচ্ছে। অনবরতই বনানীর মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার

মন কিন্তু বনানীর পাশে গিয়ে তবু দাঁড়াতে পারে না। বনানী কি বুঝতে পারে তার এই ট্র্যাজিডি? হয়ত পারে। তাই তার বিবাহিত জীবনকে তারই চোখের উপর উপহাসাস্পদ করে তুলে ধরবার চেষ্টা বনানীর নেই। তার জীবনের সে-অংশটুকু বনানী অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে। ভালো করেই জানে সত্যবান এ-কথা। তবু তার ভয় আছে, আছে সঙ্কোচ।

"নিজের জীবনকে তুমি তেমনই করে তুলতে চাও, বনানী?"

"হ্যাঁ। আমি সত্যিকারের মার্ক্সবাদী হয়ত নই—আমি শুধু জীবনকে, পৃথিবীকে স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ভাবে দেখতে চাই।"

বনানীর মনের চেহারা চিনে নিতে বাকি নেই সত্যবানের। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই তা চেনা যায়—এত সহজ সোচ্চার তার অভিব্যক্তি। তবু বনানীর মুখ থেকে শুনে তার স্পষ্টতর পরিচয় পাবার আগ্রহ সত্যবান লুকোতে পারে না।

নিতান্ত স্থূলভাবেই সে জিজ্ঞাসা করে: "কাউকে নিশ্চয় ভালোবাস তুমি?"

"হ্যাঁ।" লজ্জায়ই হয়ত কেমন অন্যরকম দেখালো বনানীকে—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কিন্তু তাতেও হল না। আবেগের একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে লেগেছে তার বুকে। এখানে সে বসে থাকতে পারে না—দাঁড়াতেও বুঝি পারে না একমুহূর্ত। ছুটে সে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায়ও সে যেতে পারত। কিন্তু গেল যেন সতীরই খোঁজে।

একটা মনোরম আবহাওয়ায় বুঝি সত্যবান বসে আছে। নিবিড়-ভাবে গায়ে লাগুক তার স্পর্শ। সত্যবান দীর্ঘ গভীর নিশ্বাস টেনে নিলে যেন কিসের সুরভিত ঘ্রাণ নিচ্ছে। কিন্তু তা কতক্ষণ। তার-পরই ফিকে হতে লাগল সেই সৌরভ। সত্যকার পরিবেশে ফিরে

এল সত্যবান। সেখানে বই-এর পুরোনো গন্ধ, সতীর শাড়ি-ব্লাউসের পরিচিত গন্ধ, খুকীর মুখে দুধের টক গন্ধ। উঠে সত্যবান জানালায় গিয়ে দাঁড়াল—বাইরের একটা তৃতীয় দৃশ্য সেখানে পাওয়া যাবে। ঘাসের উপর ট্রাম লাইনগুলো সত্যি সুন্দর দেখায়, পায়ে-চলা পথের চেয়ে সুন্দর। আদিম মাটির উপর সভ্য যন্ত্রযুগের ইস্পাতী ইসারা। দূরের ইসারা ইস্পাতে ছড়িয়ে আছে। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।'—মনে মনে আবৃত্তি করে যায় সত্যবান। কিন্তু এ-সুদূর চোখে দেখা যায়, যেখানে সে আর বনানী থাকতে পারে, এ-সুদূরকে পাওয়া সম্ভব—শুধু বাধা যে তা সুদূর। এখান থেকে অনেক দূরের পথ।

দু'প্লেট লুচির সঙ্গে চা নিয়ে এল সীতারাম—আর দু'প্লেটে আঙুর নাসপাতি। তার পেছনে সতীর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া করতে করতেই বনানী এসে উপস্থিত হল: "বারে—তোমাকেও আমাদের সঙ্গে খেতে হবে—নইলে আমি এক টুকরো কিছু মুখে দোব ভেবেছ নাকি?"

"বলছিই ত আমি খাব—ঐ নাসপাতির এক টুকরো।"

"সত্যবানদা—আপনি কি জার্মেণীর মত ফুড-রেশনিং চালাচ্ছেন বাড়িতে?"

"ওর চেহারা দেখে তাই মনে হয়?"

"তাতে কি, কলকাতার মানুষ শুধু জল খেয়েই মোটা হয়।"

"ভুল করছ বনানী আমি কলকাতার মানুষ নই—বাঙ্গাল দেশের, যেখানে ফুড-রেশনিং মহাপাপ।" সতী অনর্গল হেসেই যাচ্ছিল।

বই-এর আলমারীর কাছ দিয়ে আসতে আসতে সত্যবান বললে: "আমার লাইব্রেরী সম্বন্ধে ত কিছু বললে না বনানী।"

"আপনি হোপলেস্, সত্যবানদা।"

"কারণ ?"

"যত রাজ্যের এগ্রিকালচারের বই এনে জড় করেছেন !"

"ভারতবর্ষ যে এগ্রিকালচারের দেশ এটা ভুলে যাও কেন ?"

"ভুলতে হবে। ইণ্ডাষ্ট্রি ছাড়া শুধু এগ্রিকালচার দিয়ে কিছু হবে না এদেশের।"

"কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রির বিকাশ আর সাফল্য অধীন দেশের পক্ষে সম্ভব কি করে ? তাই গোড়ার কথা স্বাধীনতা।"

"ভারতবর্ষ যদি স্বার্থপরের মত ভারতবর্ষেরই কিছু ভালো করে নিতে চায় তাহলে স্বাধীনতার কাছ থেকে সে কিছুটা পাবে। অবিশ্যি তা ক্ষণস্থায়ী। স্বাধীনতা কোনো দেশে সাম্য বা মৈত্রী আনতে পারে নি। তবু যদি স্বাধীনতাকেই আমরা চাই, গান্ধীজীর অসম্ভব পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি তা আসেও—সভ্যতার ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতিটা কোথায় হল বলতে পারেন ?"

"গান্ধীজীর ডি-সেণ্টে লিজেশ্যন অব ইণ্ডাষ্ট্রি ত শুধু ধনতান্ত্রিক নিগড়কে আলগা করে দেবার জন্য—তা স্বাধীনতা অর্জনের পরেকার প্রোগ্রাম না-ও হতে পারে !"

"কিন্তু স্বাধীনতা-অর্জনের পথে দীর্ঘদিন যখন মানুষ আদি গ্রাম্য-জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকবে—মানে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা-হীন জীবনে conditioned হবে, সেই অবস্থা থেকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল জীবনে তাদের ফিরিয়ে আনতে আরো কত বছর লাগবে কে জানে—আর ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হবে কি না, তা-ও বা কে বলতে পারে ?"

অনেক দিন আগেকার এম্নি একটা বিকেল মনে পড়ল সত্যবানের। সেদিনও এম্নি ধরণেই মিস্টার সেন গান্ধীজীকে আক্রমণ করেছিলেন। মিস্টার সেনের ছিল বিজ্ঞানের প্রতি একটা রোমান্টিক আগ্রহ—বনানীর আছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি। সেদিনও সত্যবান মিস্টার সেনের

সঙ্গে তর্কের সূত্র খুঁজে পায় নি—আজ আর পাবে কি করে? গান্ধীজী আজ পর্যন্ত সর্বসাধারণের হৃদয়-পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে আসছেন যা ইউটোপিয়ান কল্পনা ছাড়া কিছু নয়, কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই তার দাঁড়াবার। কিন্তু গান্ধীজীকে ছেড়ে দিলে ভারতবর্ষ কোন্ পথ নেবে—কি তার পথ আছে?

সত্যবান জিজ্ঞাসা করল : "ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় তোমাদের মতে কি মনে হয়?"

"আমাদের মত বলতে আমার মত কিন্তু বুঝবেন না—আমি যাদের মত বলব তাদের সঙ্গে আমার কাজের ঢের ব্যবধান—মন দিয়ে তাদের আমি ছুঁতে পারি, কাজ দিয়ে নয়।"

"বেশ ত—কমরেডের দল ত—বলো তাদের মত।"

"কমরেড শিশিরকে প্রায়ই বলতে শুনি, স্বাধীনতার পোশাক নেওয়াটা পৃথিবীতে সব দেশেই অচল হয়ে উঠেছে। ধর্ম যেমন আমাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে না, স্বাধীনতাও তেম্নি।"

"বুঝলুম—চাই আন্তর্জাতিকতা—বলো ভারতবর্ষের পক্ষে কি তা সম্ভব? স্বাধীনতার ধাপ অতিক্রম না করে চট করে ত সেই অমৃত-প্রাপ্তি হবে না।"

"হবে—শিশির বলে। স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্র একসঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—বলে। যদি প্রশ্ন করেন কি করে, বলে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবটা বুঝতে চেষ্টা করো।"

"যাক চেষ্টা করব।

"তা খুব করো—" সতী ধৈর্যহীন হয়ে পড়ছিল : "বেচারীকে ত বকিয়ে বকিয়ে সারা করলে—কিছু মুখে দিতে পারলে না ও।"

চায়ের শেষ চুমুকটা তাড়াতাড়ি সেরে বনানী বললে : "না বৌদি—আমার খাওয়া হয়ে গেছে।" ওঠে পড়বার আয়োজন করলে সে।

কিন্তু সত্যবান তাকে ছাড়তে চাইল না : "তোমার কমরেডটিকে ত একবার দেখতে হচ্ছে।"

একটা অদ্ভুত উৎসাহ মুখে এনে বনানী বললে : "চমৎকার ছেলে —পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ে। কি অদ্ভুত যে কাজ করবার ক্ষমতা ওর আর অদ্ভুত মেধা। আমাদের মত এত বেশি কথা বলে না।"

"মার্ক্সবাদ নিয়ে আমরা এত কথা বলছি যে তা থেকে সমস্ত শক্তি নিংড়ে নেওয়া হয়েছে—তাই তা আর আমাদের কাজ করবার প্রেরণা দেয় না।"

"আমাকে বলে শিশির, আমি নাকি সৌখীন। মনে আছে একদিন বলেছিল : 'ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আবেগ অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেওয়া এই ঘুণে-ধরা বিকৃত সমাজের একটা ব্যাধি—সমাজকে সুস্থ করে তোল, ঢের সময় পাবে মন নিয়ে বিলাসিতা করবার—আর সমাজ তখন সে-সুযোগ দেবেও। আজ তুমি মনের মুক্তি কোনো দিক থেকে পাবে, আশা কর? একটু খোলা হাওয়া নেই। কাজেই থাক না আবেগ অনুভূতি আপাতত শিকেয় তোলা—মনে করব তার দরকার নেই—স্নেহ-মমতা-প্রেম আমাদের জীবনে না-ই বা রইল এখন'।" বনানী চুপ করল—যেন তার গলা ধীরে ধীরে বুঁজে এল। একটু বিষণ্ণই হয়ত দেখাচ্ছিল তার মুখ। সে মুখে সত্যবান একটু প্রতিহিংসার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই বলল : "কমিউনিস্ট মনের লজিক এ রাস্তায়ই চলতে বাধ্য। মানুষের মুক্তির জন্যে মানুষ-হত্যা যদি হতে পারে, প্রেমের মুক্তির জন্যে প্রেমকে হত্যা করায় ত তাদের বাধে না।"

একটা ব্যথাই উদ্ঘাটন করতে চাইল বনানী : "এখানেই ওর সঙ্গে আমার মতান্তর। যতটুকু শক্তিতে কুলোয়, মানুষ হিসেবে ত স্বাভাবিক রাখতে হবে নিজেকে? মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি-

সংগ্রামে ইন্দ্রিয়রোধের প্রশ্ন কেন আসে? সত্যি বলতে কি সত্যবানদা, ওটা আমাদের ভারতীয় মনের একটা কু-প্রবৃত্তি। একটা মহৎ কাজের সঙ্গে ইন্দ্রিয়রোধটা আমরা একাত্ম করে দেখতে শিখেছি। সন্ত্রাসবাদে, স্বাধীনতা-আন্দোলনে ব্রহ্মচর্যকে টেনে আনা হয়েছে, ওদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেবার জন্যে। ব্রহ্মচর্যের এই ঐতিহ্যকে কমিউনিস্টরাও ভুলতে পারে নি।"

বনানী দাঁড়িয়ে গেল তার পর সতীর দিকে চেয়ে একটু হাসলে: "বৌদি, তোমাকে যা বিরক্ত করে গেলুম তোমার মনে না থাকলেও আমার মনে থাকবে।"

"সে কি এখুনি চলে যাচ্ছ নাকি?" সতী জিজ্ঞাসা করলে।

"মা একা আছেন—যাই আজ।" বনানী সত্যবানের দিকে চাইলে, কি বলবে মন হল, কিন্তু বললেনা কিছু। একটু থেমে থেকে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সতী আর সত্যবান। ট্র্যামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে বনানী, আশ্চর্য উদ্ধত ভঙ্গী। ট্র্যাম এল, ওর পা চালানোর দিকে চেয়ে রইল ওরা, স্বাভাবিক সাহসিকতার আকর্ষণে। তারপর সতী যেন আপন মনেই বলল: "চমৎকার মেয়ে।"

নয়
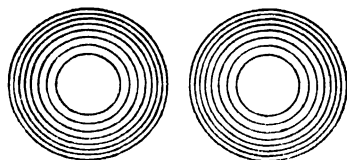
পরদিন কলেজে যাবার আগেই খামে একটা পুরু চিঠি পেলে সত্যবান। ব্যস্ত হাতে চিঠি খুলে দেখল ব্যস্ততর হাতের লেখা দু তিন সিট কাগজে অল্প কথার চিঠি। বনানী লিখেছে। কাল এখান থেকে গিয়েই। কালকেরই তারিখ কি না ভালো করে দেখে নিলে সত্যবান। তাতে ভুল নেই। জি-পি-ওতে পোস্ট করা।

২২-৫-৩৯

সত্যবান দা,

'আপনি' বলতে তোমাকে আর ভালো লাগে না। শ্রদ্ধার এই দূরত্ব আমি চাই নে। তোমাকে শ্রদ্ধা করব কি দূরে রেখে? পাশাপাশিই যদি না বসতে পারলাম সে শ্রদ্ধায় আমার কাজ নেই।

কাল একটা অন্যায় করেছি—তাই এ-চিঠি। আসবার সময় চিঠির কথাটা মুখেই বলতে পারতাম—কিন্তু বৌদি ছিল। কাউকে ভালোবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলে। কি যে তখন হল ভালো করে উত্তর দিতে পারি নি। আমি জানি তোমাকে যে ভালোবাসি এ কথা স্পষ্ট করে বলার সাহস আমার আছে—আনন্দের একটা ভীষণ উচ্ছ্বাসেই হয়ত মুখ থেকে কিছু বেরুলো না। ভুল বুঝো না—ওটা আমার লজ্জা নয়। তোমাকে ভালো লাগে এত কতদিনই আমার মুখ থেকে শুনেছ—কাজেই বুঝতে পারো—'ভালোবাসি'

এ কথাটাও অনায়াসেই বলতে পারতুম। ভালোবাসা আমার কাছে একটা সাংঘাতিক সমস্যা নয়। শিশিরকে আমি ভালোবাসতুম—কিন্তু ভালোবাসার অস্তিত্বই সে তার নিজের মনে স্বীকার করে না—কাজেই সেখানেই তার যবনিকা পতন হয়েছে। আমার মনে একটু গ্লানিও নেই।

তোমাকে কথাটা বলতে পেরে মনটা ভারি হাল্কা মনে হচ্ছে। তোমার জিজ্ঞাসার পর তোমার ওখানে যতক্ষণ ছিলাম কি রকম অস্থির লাগছিল সব সময়।

বৌদিকে চিনে নিয়েছি—ওঁর চিঠি খোলার অভ্যাস নেই—তাই এ চিঠি দিতে কোনো দিক থেকেই আমার সঙ্কোচ হল না।

বনানী।

সত্যবান অবাক হল না। একটা নিশ্চিত, অনিবার্য ফল যেন সে জেনে নিচ্ছে—থিসিসের ফল জানবার পর তার যেমি হয়েছিল। ড্রয়ার খুলে পুরোনো চিঠির গাদায় চিঠিটা রেখে চাবী বন্ধ করল সত্যবান।

কচি মেয়েটার তদারক করছিল সতী, নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছিল মেয়েটা—তবু ওর কাছে বসে বসে পাতলা চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দেওয়া, কোথায় ঘামাচি হয়েছে একটু পাউডার লাগানো, চোখে একটু কাজল পরানো—টুকিটাকি পরিচর্যা করেই চলছিল সতী।

স্নান সেরে খেতে এল সত্যবান, সতীর আরেক পালা কাজ শুরু হ'ল। একটু দূরে একটা আসন বিছিয়ে বসে ঠাকুরের ওপর এটা-ওটা ফরমাশ চালাতে লাগল। সত্যবান বেশি খেতে পারে না, এ নিয়ে সতীর আর চিন্তার অবধি নেই। ঠাকুর হয়ত তার পরামর্শ শোনে না, রান্নায় একদম মনোযোগ নেই তার। সত্যবানের খাওয়াটা

নইলে কমেই চলেছে কেন দিনদিন ? একেক দিন তাই সতী নিজেই মোটা শরীরটা নিয়ে রাঁধতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে আসে।

কলেজের জন্য তৈরী হচ্ছিল সত্যবান। মনে মনে সতীকে ভালো লাগাতে চেষ্টা করছিল। পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধে মেয়েরা নানারকম চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়—মাতৃভাব আর কন্যাভাব এ দুটো আমাদের সমাজের তৈরী সংস্কার আর তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে সখ্যভাব যা প্রত্যেক মেয়েরই সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি থেকে তৈরী। কোনো মেয়ে যখন স্ত্রী হয়ে আসে তার স্বাভাবিক সখ্যভাবের সঙ্গে মাতৃভাব বা কন্যাভাবের যে কোনো একটা শিক্ষা নিয়েই আসে। সতী মা এবং সখী—কিন্তু মাতৃত্বের চাপে সখীত্ব তার নষ্ট হয়ে গেছে। এ দুটো বিপরীত ভাবের ভারসাম্য থাকলে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধটা নির্বিরোধে চলে যেতে পারে; সত্যবানের মতে সখ্যভাবের চাপ বেশি থাকলেও ক্ষতি নেই কিন্তু স্ত্রীর সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয় মাতৃভাবের চাপ। তার দৈহিক প্রয়োজনের দিকেই সতী ঝুঁকে আছে আর মানসিক প্রয়োজনের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত। বনানীর আছে অদ্ভুত মানসিক সম্পদ। সতীর সাধ্য নেই সে-আকর্ষণ থেকে সত্যবানকে সরিয়ে রাখে। আগ্রহও নেই হয়ত। হয়ত নিজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সতী এতই নিশ্চিন্ত যে বনানীর উপস্থিতির তরঙ্গগুলোকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। বনানীর কাছ থেকে যে তার ভয় নেই এটা-ও সেই মাতৃভাবেরই স্পর্দ্ধায়। এ স্পর্দ্ধা মনে করে বাৎসল্যের যে আমোঘ আবরণ সে তৈরী করেছে তার ক্ষয় নেই।

দুটো ক্লাসের পরই আর কাজ নেই কলেজে। সত্যবান রজতের আপিসের ট্র্যাম ধরলে—ভাবলে ওকে নিয়েই বিকেলের দিকে· সুরমাদির বাড়ি যাওয়া যাবে। এ-চিঠির পর বনানীকে দেখবার

একটু কৌতূহলই হচ্ছিল তার। রজতকে দিয়ে যদি সুরমাদিকে ব্যস্ত রাখা যায়—তাহলে বনানীকে একা পাওয়া সম্ভব।

একহাতে টেলিফোনটা কানের কাছে ধরা, আরেক হাতের ফাউন্টেনপেন চিঠির কাগজের উপর ঝুঁকে আছে—এই অবস্থায়ই রজতকে গিয়ে পেলে সত্যবান। ঘাড় হেলিয়ে তাকে বসতে ইঙ্গিত করলে রজত। সত্যবান বসল, কিন্তু একটু সঙ্কোচ নিয়ে; রজতের এই কাজের ভিড়ের মধ্যে এসে ঢুকে পড়া তার উচিত হয় নি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ফাউন্টেনপেন-এর ক্যাপটা লাগাতে লাগাতে রজত জিজ্ঞাসা করল: "হঠাৎ?"

"কলেজে কাজ ছিলনা—" গম্ভীর মুখের উপর খুশির কয়েকটা স্থায়ী রেখা এনে বললে সত্যবান: "ভাবলুম তোর এখেনেই আসি। কিন্তু কাজের যা ভিড় তোর—"

"আমার কাজ? মোটেই নেই।" কলারের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে নিয়ে রজত বললে: "কাজ যা ওরাই সব করছে। টাকা ধার নিতে না হলে এ-কামরায় একটি প্রাণীও আসে না। আজকের দিনটা যাচ্ছে ভালো, অধমর্ণদের দেখা নেই।"

"ছুটি নিচ্ছিস ক'টায়?"

"ছুটি? নিলেই হয়। সব সময়েতেই আমার ছুটি।" ব্র্যাকেটে ঝুলানো কোটটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে রজত বললে: "যাবি না কি কোথাও?"

"যাব ভাবছি সুরমাদির ওখানে—কিন্তু সে-ত বিকেলে।"

রজতকে একটু অন্যরকম দেখালে। গম্ভীর হয়েই গেল যেন সে। সত্যিকারের গম্ভীর, মুখের পুরু চামড়ায় সহজে হাসির রেখা পড়ে না বলে নয়। গম্ভীর হলে ওকে কেমন বিষণ্ণ মনে হয়। তবু সত্যবান কখনো ভাবে না ওর বিষণ্ণ হবার কোনো কারণ আছে।

টাকার অভাব না থাকলে দুঃখের দাগ গভীর হয়ে পড়ে কোনদিন? রজতের বিষণ্নতায় তাই সত্যবানের সহানুভূতি নেই। কিন্তু তবু আগেকার চেয়ে সত্যবান রজতের প্রতি এখন অনেক বেশি আসক্ত। বাঁধাধরা ফরমুলায় রজতকে ফেলে দিয়ে আগে সে ভাবত—বড়লোকের মন বলে একটা পদার্থ নেই—ওরা প্রেম করে কিন্তু প্রেমে পড়ে না। কিন্তু এখন আর তাকে তা বলা যায় না। সুরমাদির সঙ্গে তার সম্বন্ধকে সত্যবান শ্রদ্ধাই করে। সাহস না থাকলেও রজতের আন্তরিকতা আছে।

"সিনেমার সময় নেই—চাঙ্‌ওয়াতেই চল্—দু-ডিস্ চাউ-চাউ, আর কিছু না হোক।" রজত সত্যবানের সমর্থন অপেক্ষা না করে উঠে পড়ল।

সত্যবানও দাঁড়াল: "তুই খেতে পারিস আমার ক্ষিদে নেই।"

"ঘরে স্ত্রী রেখে ওসব কথা বলতে নেই, লোকে স্ত্রৈণ ভাববে। না হয় রেফ্রিজিরেটারের আইস্‌ক্রীম সোডাই খেয়ে নিস্ একগ্লাস।"

মোটরের স্টিয়ারিং-এ বসে রজত বললে: "তা নয়। তোর সঙ্গে কতগুলো কথা আছে—যা আপিসের কামরায় বসে বলা যায় না।"

তুই কি ভেবেছিস চাঙ্‌ওয়ায় যেতে আমার আপত্তি?"

"হতে পারে, বার-রেস্টুরেণ্টে যেতে অধ্যাপকের শুচিতায় বাধে।"

"প্রফেসর হয়ে আর যা-ই না করে থাকি, তোর চক্ষুশূল হয়েছি।"

খুব তীক্ষ্ণ হেসে উঠল রজত, গাড়ীর স্পীডের আওয়াজের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে: "সত্যি মাস্টারদের আমি দুচোখে দেখতে পারি নে। এমন কি তোর মাস্টারমশাই-কেও না।"

"মাস্টার মশাই জাহান্নামে যান—কিন্তু আমার অপরাধটা কোথায়?"

"জাহান্নামে যাকে পাঠাতে চাচ্ছিস তিনি কিন্তু বেঁচে গেলেন—সতু, শুনিস নি কিছু ?"

"ন্-না !"

"মাস্টারমশাই বিয়ে করেছেন—এক স্কুল মিস্ট্রেস।"

"বনে না গিয়ে বিয়ে করলেন ?"

"ত্নবছর পরেই যাবেন—সস্ত্রীক—স্ত্রীরও পঞ্চাশোর্দ্ধ হয়ে নিক।"

"যাক তাহলে কাণ্ডজ্ঞান একেবারে হারিয়ে বসেন নি মাস্টার মশাই।"

"ততটুকু দয়া করেছেন—শ্বশুরকুলকে গৌরীদানের পুণ্যটা আর অর্জন করতে দেন নি।"

সত্যবান চুপ করে গেল। প্রসঙ্গটা কেমন উল্টো রাস্তায় চলেছে। ভেবে দেখল সে, সে আর রজত এ-ধরনের আলাপ করে কি কৌতুক পেতে পারে ? সুরমাদির বয়েসও রজতের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়—বনানী সত্যবানের চেয়ে ষোল বছরের ছোট।

গাড়ী থামাবার সঙ্গে সঙ্গেই চাঙ্‌ওয়ার দারোয়ানের সেলিউট—রজত একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল,—তার সঙ্গে জুটতে জুটতে সত্যবান বললে : "যা-ই হোক, ভালোই করলেন মাস্টার মশাই।"

সত্যবান সত্যি একগ্লাস কোল্ডড্রিঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই রাজী হল না। কিন্তু খানিকক্ষণ এখানে বসা দরকার, শুধু কোল্ডড্রিঙ্ক-এ ততটা সময় পাওয়া যাবে না। রজত নিজের জন্যে এক ডিশ ভেজিটেব্‌ল্ স্যুপ আর ক'টা প্রন্ কাটলেট চেয়ে নিলে।

"তোর ক্ষিদেটা আসুরিক—" সত্যবান হাল্কা হেসে বললে।

"মাস্টারদের মত আমি ডিস্‌পেপ্‌টিক নই। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থেকে স্কেপ্টিসিজ্‌ম্ আসে—এবং তুই একটি পুরোদস্তুর স্কেপ্টিক।"

নিজের মনে একটু ডুবে দেখল সত্যবান। পুরোনো অনুভূতিদের

পেছনে রেখে প্রতি মুহূর্ত সে নূতন অনুভূতির সন্ধান করছে, অনুভব করছে সে, প্রগতির একটা অবারিত প্রখর স্রোত। বাইরে থেকে এই দৃশ্যটাকে কি স্কেপ্টিসিজ্ম্-এর মত দেখায়? তার ভালো লাগে না সত্যি পৃথিবীর স্থিতিশীল চেহারা, জীবনের অপরিবর্তনীয় রূপ—সে ভালো না লাগা ত বৈজ্ঞানিক, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের একটা কথা মনে পড়ে তার—Man with his unlimited impulses can not be satisfied with his limitation—পেছনের সীমাবদ্ধ গর্হিত জীবন তাকেই আখ্যা দেয় স্কেপ্টিসিজ্ম্!

সত্যবানের সঙ্গে সঙ্গে রজতও একটু গম্ভীর হয়ে উঠল: "তুই কিন্তু একাই যাচ্ছিস সতু—সুরমাদির ওখানে—আমি যাচ্ছিনে।"

"কেন?" সত্যবান অত্যন্ত অবাক হল।

"ভাবছি আর যাব না।"

"সুরমাদি কিছু বলেছেন?"

"না। কিন্তু কি দরকার? সত্যি কি দরকার? কাকাবাবু আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—তুই ত জানিস কাকাবাবুর ইচ্ছাকে অপমান আমি করতে পারি নে। আর কেনই বা করব?"

সুরমাদির আঘাতটা সত্যবান নিজে যেন অনুভব করছিল, তাই তখখুনি আর কিছু বলতে পারছিল না সে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে এল সত্যবান—একটা কিছু করা দরকার।

"বিয়ে করা উচিত—" রজত হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল: "তা যখন উচিত, মাস্টারমশাইর মতো বয়েস না হওয়াই ভালো।"

"সুরমাদিকে তুই ভালোবাসতিস নে, রজত?" নাটকীয় ভঙ্গীতে হলেও কথাটা সত্যবান খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করলে।

"ভালোবাসতুম ঠিক নয়—পছন্দ করতুম।"

"কিন্তু সুরমাদি তোকে ভালোবাসে!"

"হয়ত বাসে। কিন্তু তাই বলে ওকে আমি বিয়ে করতে পারি নে!" ঠাট্টার সুরের সঙ্গে হাসির সুর মিশে কতকগুলো শব্দের হল্কা তৈরী করল।

"বিয়েই করতে হবে তার কি মানে আছে—ভালোবাসাই যথেষ্ট। তোর জীবনে আর কোনো মেয়ে না এলেও চলত, ওর জীবনেও অন্য কোনো পুরুষের দরকার ছিল না।"

"সুরমাদির সে-সাহস আছে কিনা জানি নে—আমার অন্তত নেই।"

"কিন্তু আমি ভেবেছিলুম তোর আছে। বিয়ে করছিস নে বলে মনে মনে অনেক শ্রদ্ধাই এতদিন তোকে করেছি।"

"সুরমাদি জানতেন, আমি একদিন বিয়ে করব।"

"জানতেন?"

"অন্তত জানা তাঁর উচিত।"

"জেনেও তোকে ভালোবাসতেন?"

কথাটা বলেই সত্যবান কেমন চমকে উঠল। বিয়ে করেছে জেনে শুনে দেখেও বনানী তাকে ভালোবাসে; এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেও কি দিতে পারে? নিজেও বা সে কী? বিবাহিত হয়েও সে কি বনানীকে ভালোবাসে নি? ভালোবাসার একটা এয়ার-টাইট্ অবস্থা আদর্শে রেখে কি হিসেবে সত্যবান রজতের সঙ্গে তর্ক করে চলেছে? যে সূত্রকে সে আক্রমণ করতে চায় তার বিপরীত সূত্রের সমর্থক হলে ত তাকে স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনের আদি আদর্শই তুলে ধরতে হয়!

"তাতে দোষ কি? যতদিন আমার স্ত্রী নেই—তাঁর ভালোবাসায়ও ততদিন অপরাধ নেই। যেদিন আমার স্ত্রী আসবেন, আমরা আর কেউ কাউকে ভালোবাসব না।"

"শ্লেটের গায়ে ভালোবাসাটা পেন্সিলের দাগ নয় যে খুশিমাফিক মুছে ফেললেই হল।"

"তা হয়ত নয় কিন্তু সুরমাদিকে ত সত্যি আমি ভালোবাসতুম না।"

রজতকে মনে হল সত্যবানের, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত আদর্শ গৃহীর মত, সংসারে লিপ্ত থেকেও যার সাংসারিক ক্লেদের স্পর্শ লাগানো নিষেধ ছিল। প্রেমের আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়েও রজত অক্ষত অবস্থায়ই বেরিয়ে এল। টাকার প্রাচীরের উপর কাকার যে রক্তচক্ষু জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তাই কি তাকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছে, না কি এখনও তার মন সেই ছেলেবেলাকার মতই অনুভূতিহীন? মানুষের ভিত্তি হয়ত বদলায় না—যা কিছু পরিবর্তন দেখা যায় সব উপরকার। সত্যবানের ছিল নতুন রং ধরবার আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এখনো সে চলেছে। এই ভালো—আর রজত যা ছিল, রজত যা আছে তা ভালো নয় এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা সত্যবান করতে পারে কি? কার্ল মার্ক্স বলবেন—তোমাদের আবার ভালোমন্দ, ধনোৎপাদন বা ধন-বণ্টনের মধ্যে তোমরা কেউ নও, তোমাদের জীবনের ভিত্তিই নেই, হাওয়ায় তোমরা দুলবে। হাওয়ায় দুললেও যে অর্কিডের মত ফুলন্ত আমরা হই, দেখা না গেলেও গাছের খাদ্যই আমরা খাই। সমাজের সঙ্গে আছে আমাদের বন্ধন, আমরা বদলাইনি সে-সমাজের ভিত্তি এখনো নড়ে ওঠে নি বলে। সমাজের ভিত্তি টলাতে যে পরিবর্তন দরকার তা হয়ত আমাদের জীবনে এসে দেখা দেয় না; তাই বলে কি সমাজের অন্তরের আলোড়নকে অনুভব করিনে? যে-পথে সমাজের পূর্ণ পরিণতি তার এক কণা আলো ত চোখে পেতে পারি, সমাজের দুঃসহ গ্লানির অন্ধকারে একটুও ত ব্যাকুল হয়ে উঠি! অবিশ্যি কেউ কেউ তাতেও চোখ বুঁজে থাকে। তারা আর আমরা কি এক?—সবই ইতর বুর্জোয়া?

সত্যবান ষ্ট্র-পাইপে টেনে নিচ্ছিল মিষ্টি, তেজী, ঠাণ্ডা জল। রজত একটা দানবের মত রুটি-মাখন আর কাট্‌লেটের টুকরো চিবিয়ে চলেছে। ক্ষিদে পাওয়াটাই রজতের সবচেয়ে প্রখর আর জাজ্বল্যমান বৃত্তি। বেশি যাদের ক্ষিদে পায় আর বেশি যারা খায়, হয়ত সূক্ষ্ম অনুভূতির তন্তুই তাদের মগজের 'গ্রে-সেল্'-এ থাকে না।

খাওয়া শেষ হলে সত্যবান জিজ্ঞাসা করলে: "সত্যি তুই তাহলে যাচ্ছিস্ নে?"

"যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।"

সত্যবান চুপ করে গেল। রজতের সঙ্গে কথা বলতেও কেমন ঘৃণা হচ্ছিল তার। হয়ত যুক্তিতে রজতকে ধরা ছোঁওয়া যাবে না। কিন্তু যুক্তিই ত সব নয়।

বাইরে এসে রজত বললে: "তোকে এল্‌গিন রোড অবধি পৌঁছে দিতে পারি। ওখানে কাকার এক বন্ধুর বাড়িতে আমি যাচ্ছি।"

"না-থাক, ট্র্যামেই আমি যাব।" সত্যবান একটা সিগারেট ধরালে।

"ট্র্যামে কেন? এল্‌গিন রোড থেকে পদ্মপুকুর কতটুকুই বা?"

"না।" একটু অস্বাভাবিক জোরেই বললে সত্যবান।

"আচ্ছা। চিয়ারো।" কাৎ হয়ে মোটরের গহ্বরে গিয়ে ঢুকল রজত।

একটা প্রবল আক্রোশকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী করে ছেড়ে দিতে দিতে এস্‌প্ল্যানেডের দিকে সত্যবান পা চালিয়ে দিলে।

দশ
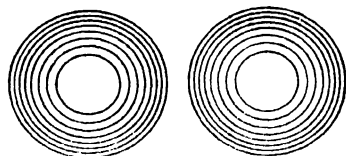
"বনানী নেই—ওদের কোন্ চাঁই-কে অ্যারেস্ট করেছে—দেখা করতে গেছে তাই। একা একা ভালো লাগছি না, বইগুলোকে নিয়ে আবার পাতা উল্টোচ্ছিলুম—" সত্যবানের মুখের উপর একটা অসহায়, ম্লান দৃষ্টির ছায়া ফেললে সুরমা।

বনানীকে না পাওয়ার হতাশা খুব বড় হয়ে উঠল না সত্যবানের কাছে। সুরমাকেই কেমন যেন ভালো লাগছিল আজ। হতে পারে যে এ ভালো লাগার মানে অনুকম্পা।

"কি বই?" সত্যবান উৎসুক হল।

" 'শেষ প্রশ্ন'—শরৎবাবুর। কমলকে ভালো লাগল না আমার কোনদিন।"

"কেন? নিরামিষ খায় বলে?"

"সে ভালো না লাগা ছেলেমানষি। কমলের ক্ষণিকবাদ থিয়োরী প্র্যাক্‌টিস্ হিসেবে অচল।"

"তা-ত অচলই। শরৎবাবু নারী-পুরুষ সম্বন্ধের সব চেয়ে মুক্ত আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু সেই আদর্শের ভিত্তির খোঁজ রাখেন নি।"

"কমল তর্ক করে বটে কিন্তু আবেগময়তা ছাড়া ওর আর কিছু সম্বল নেই।"

"অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্বাধীন না হলে কমলের আদর্শ মাঠে মারা পড়ে।"

"তাছাড়াও ক্ষণিকবাদকেই আদর্শ মেনে নেওয়া উচিত নয়। পুরুষকে গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার দরকার মত মেয়েদের থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে অনবরতই মেয়েরা তা করে চলবে এমন ত হতে পারে না।"

"পুরুষ-নারীর আবেগময় সম্বন্ধকে স্থায়ী করতে পারে, তাদের দুজনেরই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।"

"সত্যি কিসের জোরে যে এ-সম্বন্ধ সুন্দর সুস্থ হয়ে উঠতে পারে—তা ঠিক বুঝতে পারি নে, সত্যবান। তোমরা সব কিছুর পায়েই অর্থনীতির শিকল দেখতে পাও কিন্তু আমার জীবনে আমি কখনও তা দেখতে পাই নি। বাবা আমাকে প্রয়োজনের বেশি টাকাই দিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক অধীনতা আমার ছিল না—কিন্তু জীবন যে আমার সুখের নয় তা ত তুমি জানো।"

মিথ্যা নয়। রজত সুরমাদির ভালোবাসার অপমান করতে পারল কিসের জোরে? সুরমাদির উপর এতটুকু স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ পারিপার্শ্বিক কোন্ অবস্থা থেকে গ্রহণ করেছে রজত? সুরমাদিকে ভালোবাসত না সে? ঘৃণা করে দূরেও ত সরে থাকে নি! সমাজের ভয়? বিয়ে তাদের না-ই বা হ'ত!

সুরমাদি-ও বা কেমন? পুরুষের প্রয়োজন স্বীকার করতে তাঁর সঙ্কোচ নেই, নেই অর্থের অভাব—তবু কেন নিজেকে এম্নি তিনি নির্যাতিত হতে দিচ্ছেন—কোনো যুক্তি, কোনো মীমাংসা সত্যবানের মাথায় উপস্থিত হল না।

অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে সুরমা বললে: "কি হয়েছে জানো, সত্যবান? আমরা সব পচে গেছি —যুদ্ধের আগে যাদের মন,

সংস্কার, আদর্শ তৈরী হয়ে গিয়েছিল তারা সবাই। ক্যান্সারে-ধরা শরীর, তার প্রতিষেধক অষুধপথ্য নেই। সমস্ত থিয়োরীই আমাদের বেলায় বিফল হয়ে যায়।"

কথা বলতে বলতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল সুরমা। দ্রুত নিশ্বাস নেবার ভঙ্গীতে তাই বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করেই বলে উঠল সত্যবান: "আপনার শরীর খুব খারাপ দেখাচ্ছে সুরমাদি!

"শরীর নয়, হার্ট।" সুরমা অদৃশ্য মত একটু হাসলে।

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। ডিজিটিলিস্ আর রেষ্ট, ডাক্তারের সাবেকী পরামর্শ। জীবনটাই ত আমার রেষ্ট। অষুধও খাই মাঝে মাঝে।"

"একটা চেঞ্জে-টেঞ্জে গেলে হয় না?"

"চেঞ্জে অসুখ সারবে না—তবে ভাবছি যাব। কোলকাতা আর ভালো লাগে না। বনানী বলছিল পুরী যেতে।"

"ভালো। মাস কয়েক ঘুরে আসুন।"

সত্যবান ভাবছিল মানসিক দুরবস্থাই সুরমাদির হার্ট নষ্ট করবার কারণ। যৌনবোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও যখন তাকে প্রতিরোধ করতে হয়—দেহের কত যন্ত্রই বিকল হয়ে উঠতে পারে তাতে।

"কিন্তু একাডেমিক আলোচনায় আমার বাধা নেই, সত্যবান। নার্সের মত তুমি গম্ভীর হয়ে আছ কেন?"

একটু অপ্রতিভ হয়েই সত্যবান সুরমার প্রতি মনোযোগী হল।

"শেষের কবিতা নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগে—নিখিল ভটচাযের সাকরেদ যখন তোমরা!"

"তারজন্যে নয়, বই হিসেবেই শেষের কবিতা ভালো।"

"রবিবাবুর বই, বই হিসেবে যে ভালো হবে তা ত জানা কথা। কিন্তু অমিত-লাবণ্যর সম্বন্ধটাকে তুমি সমর্থন কর?"

সমর্থন না করলেও তাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা সত্যবানের কোথায়—তার জীবনেও বনানী এসে দাঁড়িয়েছে—এত বড় সত্যকে যুক্তির সত্ত্বেও টলানো যায় না। প্রশ্নটাকে তাই এড়িয়ে যেতে চাইল সত্যবান: "আপনি নিশ্চয়ই করেন না।"

"না। তাতে কিটির প্রতি হয় অবিচার, লাবণ্যর প্রতি দেখানো হয় ঔদাসীন্য। আমাদের চোখ আকাশ ছুয়ে থাকতে পারে তার জন্যে কি পা মাটিতে থাকবে না? মানসিক সংস্কৃতির উর্ধ্বলোকেই শুধু অমিত-লাবণ্যর মিলন হবে, আর অমিতের স্থূল পিপাসা মেটাবে কিটি? লাবণ্য সেখানে নেমে আসতে পারে না? সংস্কৃতির বাষ্পে চলা এই পুতুলকে নিয়ে কোনো সমাজ চলবে না। সমাজ মানুষ চায়, স্থূলতাকে স্বীকার করে স্থূলতাকে জয় করতে পারে যে-মানুষ, তাকেই চায়।"

"অমিতকে কি আপনি ও-ভাবে দেখতে পারেন না যে একজন মননশীল লোক সংস্কারগত যৌন-আকর্ষণকে একটা সুন্দর আবহাওয়ায় নিয়ে উপস্থিত করেছে?"

"সুন্দর বলতে পারি কিন্তু সুস্থ বলব না।"

"আপনি কি বলতে চান মানুষের মূল সংস্কারের সহজ স্বাভাবিক চেহারাই সুস্থ—আর তার পরিবর্তন সুস্থ নয়—ইভলিউশনকেই তাহলে আপনি অসুস্থ বলছেন বলুন।"

"তোমাদের ইভলিউশনে ভিত্তির রূপান্তর হয় না, হয় ভঙ্গীর রূপান্তর—তাই তাকে যদি অসুস্থ বলি তাতে দোষ কি? সুস্থ বলব রি-ভ্যালুয়েশনকে—সাধারণবোধ্য নাম যার রিভলিউশন। যৌনতার অভদ্র চেহারা নিয়ে অমিত যেন মুস্কিলে পড়ে গেছে—ব্যস্ত হয়ে তাই তাকে সে একটা ভদ্র পোশাক পরিয়ে উপস্থিত করলে। যৌনতা সম্বন্ধে এতটা সচেতনতা, তাকে নিয়ে শ্লীলতাহানির ভয়, অত্যন্ত

পুরোনো মনোভাব নয় কি ? এ মনোভাবকে দূর করতে পারে নি অমিত। যৌনতাকে আমি যদি গোড়া থেকেই অভদ্র না ভাবি, অশিষ্ট ও অশ্লীল মনে না করি—তার যতটুকু প্রাপ্য তা-ই তাকে দিই—তা হলেই শেষটায় আর তাকে এত মূল্যবান পোশাক পরাতে হয় না।"

"তাহলে একরকম ধরে নেওয়া যায় মনের উর্ধ্বযাত্রার আপনি বিরোধী।"

"না। একটা সাধারণ প্রবৃত্তি নিয়ে মনের বিলাসিতার বিরোধী। গ্ল্যাণ্ডগুলোর স্বাভাবিক স্রাবে শরীরের নিয়মিত চেহারা টিঁকে থাকে—শরীরের পক্ষে তেমি দরকার বৃত্তিগুলোর সাধারণ, স্বাভাবিক প্রশ্রয়। তাদের ঘাড়ে মনের দৌরাত্ম্য চাপিয়ে দিলে, অসাধারণ, অস্বাভাবিক তারা হবেই। মনের ত ঢের কাজ পড়ে আছে, কাজের জায়গার অভাব কি ?—কোটি কোটি মানুষের সমাজ আছে, আছে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অনাবিষ্কৃত রহস্য—তাকে ভুলে থেকে শরীর নিয়ে মেতে থাকবার কি মানে হয় ?"

এই একটা জায়গায় সুরমার সঙ্গে বনানীর আশ্চর্য মিল। নিজের জীবনের ব্যর্থতা পাছে মেয়ের জীবনকেও স্পর্শ করে সেই আশঙ্কায়ই হয়ত বনানীকে সুরমা এ ব্যাপারটাতে অন্ধকারে রাখতে চায় নি। সন্তানকে জীবনের সাদাসিদে চেহারার সঙ্গে মুখোমুখি করে দেওয়াই ত বাপমার কর্তব্য—আর কিছু করবার তাঁদের দরকার নেই। নিজের রুচির ছায়া ফেলে সন্তানকে গ্রাস করবার অপচেষ্টা সত্যবানের কাছে গর্হিত মনে হয়। শ্রদ্ধা করবার মত বস্তু সুরমাদির মধ্যে এখনও অনেক কিছুই আছে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে সত্যবানের।

"সত্যবান—" এম্লিতর করুণ ক্ষীণ স্বরে সত্যবান চমকে ওঠে। "জানো, জাত হিসেবেই আমরা ফাঁপা। কেন হব না বল। সমাজে একটা মৃত দেহে আমরা ঝুলে আছি। তাছাড়া আমাদের

সাহিত্য—জীবন সম্বন্ধে সত্য ইঙ্গিত বাংলা সাহিত্যে কোথাও তুমি পাবে না।”

“একথা আমি মানি, সুরমাদি। সত্য-প্রকাশের ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যের নেই, খানিকদূর অবধি পৌঁছেই তার যাত্রা শেষ হয়ে গেছে তারপরই শুরু হয়েছে আঙ্গিকের কারিকুরি।”

“রবিবাবু-শরৎবাবুর পর অতি আধুনিক সাহিত্য এল কিন্তু কোনো নতুন ভাবধারার জন্ম হল না। অবাধ যৌন-মুক্তির গান গেয়ে কোনো লাভ আছে? মনে হয় রুদ্ধ, বিকৃত যৌনাবেগ কাগজের পাতায় তার ইচ্ছাপূরণ করে যাচ্ছে। এই নিউরোটিক সাহিত্যে জাত তৈরী হয় না। ভোল্টেয়ারই জাত তৈরী করে ফরাসী-বিপ্লব করাতে পারেন, যাঁর লিখবার সাহস ছিল: “Men created God in his own image.” ভাবতে পারো অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসে বাইবেলকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন!”

“আমাদের দেশে মনুসংহিতাই এখনো অচল হল না।”

“অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের দিয়ে অনেক আশা করেছিলাম আমি, কিন্তু প্রগতির আদর্শের সঙ্গে তারা প্রতারণা করেছে। বনানী বলছিল, আজকালকার প্রগতি-সাহিত্যের কথা। সেটা কেমন জানো? একটা জার্মান মেসিন এনে পার্ট্স্ খুলে আমরা ছাঁচ তৈরী করলুম—সেই ছাঁচে এবড়োখেবড়ো কতকগুলো পার্ট্স্ তৈরী হল, সে-পার্ট্স্ জড়ো করে স্বদেশী মেসিন তৈরী হয়ে গেল। এ-মেসিন চলে বটে তবে না চলারই আশঙ্কা তার বেশি। বাংলা দেশের প্রগতি সাহিত্য স্বদেশী মেসিনেরই মত।”

“যে কথা প্রগতি সাহিত্যিকরা বলে তার সঙ্গে তাদের রক্তের যোগাযোগ নেই—এমনকি বিশ্বাসেরও দৃঢ়তা নেই। এ যেন একটা ফ্যাসান। মার্ক্সবাদ বাংলাদেশে এসে ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে।”

"মানসিক বিলাস আমাদের মজ্জাগত। উনিশ শতাব্দীতে ধর্ম নিয়ে এ বিলাস হয়েছে—এ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে বড় কথার বিলাস। এ রোগ থেকে নিজেও আমি মুক্ত নই—তুমিও মুক্ত নও—বনানী বলে সে কাজ করে কিন্তু আমি জানি কথাই বলে বেশি!"

কিন্তু হার্টের রোগী সুরমাদির বেশি কথা বলা উচিত নয়—সত্যবান সচেতন হয়ে উঠল। আড়মোড়া ভেঙে বললে: "অনেক কথা বলা হল। চলি আজ।"

"সে কি, বোসো! বনানী এক্ষুণি আসবে হয়ত।"

সত্যবান একটু লজ্জার উষ্ণতা অনুভব করলে। তার চোখে-মুখে হয়ত বনানীর জন্য প্রতীক্ষা স্পষ্টভাবে আঁকা থাকে। সে চিহ্ন সুরমাদির দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। তাহলেও তার জন্য কোনো উদ্বেগ বা আশঙ্কাই সুরমাদির নেই—তাতেই খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে নিল সত্যবান। মনে মনে ধন্যবাদও জানালে সুরমাকে। ভারত-বর্ষের কোথায় কেমন জলবায়ু তাই নিয়ে কথা তুলল সুরমা—সত্যবানের তাতে খুব বেশি আগ্রহ না থাকলেও বনানীর অপেক্ষায় আগ্রহ আছে। সে-ও ভিড়ে গেল এ ভৌগোলিক আলোচনায়।

এগারো
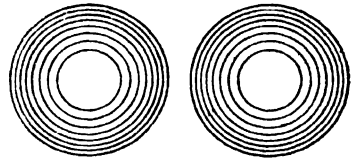
সতীর মা ক্ষমা করেছেন সতীকে। মিঃ সেন বেঁচে থাকলে হয়ত এ ক্ষমা আসত না। সতীকে প্রশ্রয় দেবার তাঁর যে জেদ ছিল তাকে কঠোরতর জেদে প্রতিরোধ করতে চাইতেন মিসেস সেন। এ দ্বন্দ্বের একটা উত্তেজনা আছে। কিন্তু সে উত্তেজনার ঘরে শূন্য পড়ে যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে। স্ত্রীর বিরোধিতায় স্বামী যা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন জীবিত কালে, স্বামীর মৃত্যুতে তারই প্রতি আসক্ত হতে থাকেন স্ত্রী। সতীকে মনে পড়ল মিসেস সেনের এই পূজোর ছুটিতে। সতীরও মনে লাগল মাকে। সত্যবানকে পাওয়া তার হয়ে গেছে—যথেষ্টই হয়েছে—তার জেদের ঘরে এখন শূন্য। পেছন ফিরে তাকানোয় আর এখন বিপদ নেই—বরং ভালো লাগে তাকাতে।

ছেলেপুলে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ চলে গেল সতী। সত্যবান রয়ে গেল। ভালো লাগছিল না তার। বহুদিন পর একটু নিরিবিলি থাকা—পরিপূর্ণ একা—ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ হয়। অবিশ্যি মুখে তাকে বলতে হল—'বহু প্রতীক্ষিত যুদ্ধ এসেছে পৃথিবীতে, তার ফলাফলের উপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—কলকাতায় না থাকলে যুদ্ধের খবরই পাওয়া যাবে না সঠিক।' সত্যবানের কথার বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতী দাঁড়াতে জানে না।

বনানী নেই, সুরমাদি নেই—তারা পুরীতে। আছে রজত। এই যুদ্ধের দিনেই হয়ত সে বিয়ে করছে। সৈন্যদের মত। অথচ সৈন্যদের মত জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস তার কোনদিন হবে না। জীবন তার সোনার খাঁচায় পোষা। পৃথিবীর দিকে চোখ বুঁজে সে জীবন পুষে চলবে। এ-সময়ে পোল্যাণ্ডে থাকলেও হয়ত সে এরোপ্লেন চার্টার করে আমেরিকায় পালাত। এস্‌কেপিষ্ট্‌! ঘৃণায় সত্যবানের চোখমুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে দীর্ঘ চিঠি আসে বনানীর, দীর্ঘতর উত্তর দেয় সত্যবান। সে সময়টার জন্যেই শুধু একটা রমণীয় আবহাওয়া ঘনিয়ে আসে তার মনে, মনে হয় বনানীকে ছুঁয়ে আছে তার মন। মনে ফিরে আসে অনেক দিনের অনেক তুচ্ছ ঘটনা, বনানীর ভালোবাসা আর অভিমানের স্নিগ্ধতায় যা সত্যবানের কাছে কতকগুলো অনুভূতি হয়ে আছে। একেক সময় ভাবতে অবাক লাগে কি করে বনানী বয়সের ব্যবধানকে মুছে দিল! মুছে দিলেও ত মেয়েদের মানসিক ধর্মের আইন অনুসারে সখ্যভাবের সঙ্গে কন্যাভাবই বনানীর মিশে থাকত বেশি। একটা অগাধ সমীহ, অপরিসীম সম্ভ্রম ফুটে উঠত বনানীর মুখে সত্যবানের সামনে এলেই। কিন্তু বনানীর ত তার পাশাপাশি বসতে, মুখোমুখি চাইতে কোনো সঙ্কোচ নেই। অথচ এই সুন্দর স্পর্দ্ধায় বনানীর অবয়বে সামান্য কাঠিন্যও ফুটে ওঠে না।

বনানীর চর্চায় অনেক সময়ই কেটে যায়—তবু আরো অনেক সময়ই থাকে।

সত্যবান যুদ্ধের খবরে বোঝাই দৈনিক কাগজের উপর চোখ বুলোতে থাকে। চারিদিকে অগণিত মৃত্যুর নির্বিকার ঘোষণা। কিন্তু প্রত্যেকটি মৃত্যুর পেছনে যে একটি করে জীবন আছে তা কি সংবাদদাতারা জানে? জানে কি সেই প্রত্যেকটি জীবনে আশা-

নিরাশার কত ঢেউ এসে মিশেছিল, প্রকৃতির কত বিরোধিতাকে জয় করে চেয়েছিল বিস্ফারিত হতে! মৃত্যু যেন শুধু একটা সংখ্যা, কালির হরফে তার হিসেব দিয়ে দিলেই সব চুকে যায়! সত্যবানের বুক নরম হয়ে আসছে আজকাল, যে কোনো জীবনের উপর যে কোনো আঘাত সিস্‌মোগ্রাফের মত তার বুকে স্পন্দন আনতে পারে—বুঝতে পারে সত্যবান বয়েস যখন তাকে দৃঢ় করে তুলছিল তখনই তার জীবনে এসে লাগল বনানীর উত্তাপ। এ-যুদ্ধই কি হবে পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ? তারপর কি মানুষ শান্তির আর মৈত্রীর পরিমণ্ডলে মানুষের সত্যিকার ইতিহাস রচনা করতে পারবে? শেষ হয়ে এল কি পৃথিবীর দুঃখের রাত্রি? হয়ত হয়ে এল। সত্যবানের মনের কামনা অন্তত তা-ই। কিন্তু তার ইকনমিক্সের বিচার-বুদ্ধি এতটা আশাবাদী নয়, যুদ্ধের পরেও ধনতন্ত্রের রুদ্রমূর্তি ফ্যাসিজ্‌ম্ বেঁচে থাকতে পারে, ক্ষণস্থায়ী হলেও তার প্রেরণায় একদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে—অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় তারপর আবার যুদ্ধ।

কাগজে যদি হঠাৎ বেরত যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, এবং এই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ হল—তাতে সত্যবান যতটা অবাক হত বনানীকে সামনে দেখে তার চেয়েও বেশি দুরবস্থা হল তার।

"চলে এলুম, সত্যবানদা।" অত্যন্ত সহজ ভাবে বললে বনানী। ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্যুটকেসগুলো আর বিছানপত্র দরজায় এনে তুলে দিয়ে গেল।

এটাচি থেকে সাবান আর গামছা খুলে নিয়ে বললে বনানী: "স্নানটা করে আসি, বলব সব।"

নির্বাক হয়ে সত্যবান পর্দার গায়ে বায়োস্কোপের ছবি দেখে যেতে লাগল। তার চোখের সামনে যে দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে তাতে তার টুঁ শব্দ করবার অধিকার নেই। বনানী চলে গেলে ইণ্টারভেলের

আলো জ্বলে উঠল যেন—সত্যবান ফিরে এল নিজের মধ্যে। বনানী কেন এসেছে—না-ই বা জানল সে সে-কথা, বনানী এসেছে তা-ই কি যথেষ্ট নয়? অবারিত মুক্তির মধ্যে এই ত প্রথম সে বনানীকে কাছাকাছি পেল, যেখানে সতীর নির্বোধ উপেক্ষা নেই, স্নুরমাদির নির্বিরোধ সচেতনতা নেই। তেপান্তরের মাঠের মতই যেন একটা বিরাট সম্ভাবনা তার চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে। এই সীমাহীনতায় মনও অনুশাসনহীন।

সমস্ত স্নায়ুতে একটা অস্থিরতা অনুভব করছিল সত্যবান—পর পর ছুতিনটে সিগারেট ভস্ম করে তাতে আহুতি দিতে হল।

বনানী এল। জলের সদ্য স্পর্শ লেগে আছে তার সমস্ত শরীরে। সত্যবান এত স্নিগ্ধ তাকে আর কোনদিন দেখে নি।

"বারে—বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখলে যে?" নীচের পুরু ঠোঁটটা হাসির টানে অসম্ভব লালচে হয়ে উঠল বনানীর।

"এখানেই ত থাকছ?" সত্যবানের কণ্ঠ তরঙ্গহীন।

"কে বললে?"

"আমি।"

একসঙ্গে ছুজনেই হেসে উঠল। ঝর্ণার আওয়াজ বনানীর হাসিতে। স্মৃতিতে খুঁজতে লাগল সত্যবান, কবে—কোথায় যেন এ-হাসি সে আগেও শুনেছে। গঙ্গার ধারে—বোটানিক্যাল গার্ডেনে কি—সতী যখন বনানীর মতই ছিল?

সমস্ত ঘরে পায়চারি করে চুল আঁচড়াতে লাগল বনানী। এত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী যেন এ ঘর ওরই, যেন ওর ঘরে আর কেউ বসে নেই, এমন কি গুণগুণ করে একটা গানও ও গাইতে পারে।

আবেগ নিয়ে মেতে থাকলেই চলে না, বৈষয়িক হবার বয়েস হয়েছে সত্যবানের: "ব্যাপার কি বলো ত। মা কোথায়?"

স্বচ্ছন্দ গতিতে একটু ছেদ পড়ল বনানীর, তখখুনি তা যেন আবার সামলে নিলে : "বলছি।"

"নিশ্চয়ই ঝগড়া করে চলে আসো নি!"

"মা চলে গেছেন।"

"কোথায়?"

"জানি নে।"

"মানে?"

"পরশু ঘুম থেকে উঠে টেবিলের উপর মার চেক বইটা পেলুম—ভেতরে দুখানা চিঠি। একখানা চিঠিতে ব্যাঙ্ককে বলে দিচ্ছেন ওঁর একাউণ্ট আমি ওপারেট করব—আরেকখানা চিঠি আমাকে লেখা—"মা মণি, তোর পক্ষে আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, তোর পাশে আমার এখন বেঁচে থাকা, শুধু তোকে যন্ত্রণা দেওয়া। আমার যাবার জন্যে দুঃখ করিস নে।" ছোট্ট চিঠি!"

"রোগা শরীরে কোথায় গেলেন খোঁজ কর নি?"

"করেছিলুম—পুরীতে কোথাও নেই। হোটেলের মালিক পুলিশকেও খবর দিয়ে দেখলেন।"

"বাঃ—তাতেই হয়ে গেল?"

"হয় নি আমি জানি" ভারি হয়ে এল বনানীর কণ্ঠ : "কিন্তু আমি কি করতে পারি? মা চলে গেলে আমি কত একা, তুমি তা জানো না?" বনানীর চোখ জলে টলটল করে উঠল।

"আমি জানি" গলা নামিয়ে আনল সত্যবান : "তুমি একা—আমি জানি।"

"পুরীতে এক ফোঁটা চোখের জল আমার কেউ দেখে নি। কাকে দেখাব? তোমার কাছে আমি আমার ব্যথা ঢেকে রাখতে পারি নে।"

একটা চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়ল বনানী—মুখ ফিরিয়ে নিলে চেয়ারের পিঠে।

"শোনো—" অগাধ সহানুভূতি নিয়ে সত্যবান ডাকলে।

"তবু চেষ্টা করেছিলুম ভুলে থাকতে—"

"অমন করো না—ছিঃ। তুমি একা কখখনো নও। তোমার মাও জানতেন আমি তোমার পাশে আছি।"

"আমি জানি।" বনানী আঁচলে চোখ মুছে নিল : "রেলগাড়ীতে সমস্ত সময় ছটফট করেছি। তোমাকে দেখে ভুলে গেছি সব।"

"তোমার মা ভালোই থাকবেন—যেখানে থাকবেন। জীবন সম্বন্ধে তাঁর আর মোহ নেই—দুর্বল নেই জীবনের কোনো দিক!" নিজের কানেই কথাগুলো তেমন ভালো শোনালো না সত্যবানের—মনে হল ধর্মযাজকের উপদেশের মত। সত্যবান ভালো করেই জানে, সুরমা আত্মহত্যা করতে পারে, পারে এখনও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে, কাশীবাস করাও তারপক্ষে বিচিত্র নয়। জীবনের যে কোনো বিকৃত রূপ তার কাম্য হতে পারে। এ-কথাগুলো সত্যবানকে বলতে হল শুধু বনানীর মুখের দিকে চেয়ে। এর ফাঁকি হয়ত এ-অবস্থায় বনানী বুঝতে পারবে না, কিন্তু অন্য যে কোনো সুস্থ অবস্থায় তা একসময় ধরা পড়বেই।

বনানী নিজেকে কতকটা গুছিয়ে আনলে : "আমি মনে করব মা ভালোই আছেন। আমার কোনো অপরাধে ত মা চলে যান নি!"

তা-ই বা কে বলবে? বনানী যে ধীরে ধীরে সত্যবানের কাছে এগিয়ে গেছে তা কি সুরমা লক্ষ্য করে নি? একদিন নিজেও সুরমা তাই করেছিল—একদিন যা সে করেছিল, মনে হয়েছিল যা জীবনের একটা নিগূঢ় সত্য বলে—তা কি সে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছে আজ? কে বলবে যে আজও সুরমা সত্যবানকে ভালোবাসে না?

কিন্তু তা-ই বলে সে বনানীর সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না, পারে শুধু সরে যেতে। সুরমার চলে যাওয়াতে সত্যবান নিজকে অনায়াসে অপরাধী মনে করতে পারে।

আবার স্বাভাবিক হয়ে এল বনানী: "আমি তোমার সঙ্গে থাকব।"

"বেশ ত।"

"যতদিন ইচ্ছে।"

"তা-ই হবে।"

"বউদি এলেও যাব না।"

"যেও না।"

"বউদি কিছু বলবে না?"

"না।"

"তুমি জানো না।"

"জানি।"

পা নাচাতে শুরু করলে বনানী: "একটিবার ত তুমি গেলে না পুরী—সমুদ্রের দিকে চাইলে কি যে মুক্ত মনে হয় নিজকে। আমি রোজ স্নান করতুম, আরেকটি ছেলে ছিল বিমল, বোনকে চেঞ্জে নিয়ে এসেছে,—দুর্দান্ত সাহস, নুলিয়ারাও হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়।"

"রোজ স্নান করে ত কালো হয়ে এসেছ।"

"পুরীর রং দুদিনেই মুছে নেবে কোলকাতা।"

"কমরেড শিশিরের খবর কি? তার সঙ্গে ত আমার পরিচয়টা করিয়ে দিলে না—" হঠাৎ শিশিরের কথাটা খাপছাড়া শোনাল। কিন্তু সত্যবানের মনে চিন্তার পারম্পর্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি—বিমলের নামটা সে ভুলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল তার, বনানী যেন নাড়ী টিপে দেখছে—দেখছে বিমলকে সামনে এনে; সত্যবান বিচলিত হয় কি না।

"ওর জেল হয়েছে।"

"সত্যিকারের কাজের ছেলে শিশির—তোমাদের মত সৌখীন নয়।"

"তা-ত নয়ই। আমাদের অপরাধ রাখবার ঠাঁই কোথায়? জেনেশুনে আমরা পাপ করছি—জানি শুধু কালি আর কাগজ অপচয় করে বিপ্লব করতে।"

"বিপ্লবীদের ফ্রয়েডিয়ানরা কি বলে জানো? ওরা না কি ঈডিপাস কমপ্লেক্সে ভুগছে।"

"কি করে?" বনানী শাণিত হয়ে উঠল।

"পারিবারিক জীবনে বিপ্লবীদের নাকি বাপের উপর একটা আক্রোশ থাকে। পিতৃশাসনকে উপেক্ষা করবার অভ্যাসই ক্রমে সামাজিক বিপ্লব-চেষ্টায় রূপ নেয়।"

"ফ্রয়েডিয়ানরা মানুষকে সভ্যতার দৃষ্টি নিয়ে দেখতে জানে না, দেখে আদিম মানুষের দৃষ্টি নিয়ে।"

"তোমাদের মার্ক্সই বলেছেন আমরা প্রাক্-ইতিহাসে বাস করছি—মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস এখনো শুরু হয় নি।"

"তুমি ত মার্ক্স দিয়েই মার্ক্সের গলা কাটবার চেষ্টা করছ।" বনানী অভিমান অভিনয় করলে।

"মার্ক্সের অর্থনীতিতে তোমরা এমন কি একটা বিরাট ব্যাপার দেখতে পাও? অর্থনীতির ক্রমবর্দ্ধমান শাস্ত্রে বুর্জ্জোয়া অর্থনীতির শেষ অধ্যায় ওকে বলা যায়। ক্ল্যাসিকেল ইকনমিক্সের ধাঁচে তৈরী ওঁর 'ক্যাপিটেল'—সম্পূর্ণতাহীন, অর্থহীন, কুয়াশাচ্ছন্ন অনেক কথাই তিনি অনেকবার ব্যবহার করে গেছেন।"

"কিন্তু সারপ্লাস্ ভেল্যু? ওটা কত বড় আবিষ্কার!"

"মার্ক্সের অর্থনীতির মূল ব্যাপারটাই এই যে তা শ্রমিক-মজুরদের পক্ষ থেকে দেখা। বিক্রয়যোগ্য মাল তৈরী করতে ধনিকের কারখানা আর শ্রমিকের শ্রমশক্তি চাই। মালের দামটার জন্যেই

শ্রমিক শ্রম করে না,ধনিকের মুনাফার জন্যও কতকটা শ্রম অপচয় করে —তাইত সারপ্লাস্ ভেল্যু ? কিন্তু এই শ্রমশক্তির সঠিক নির্ভুল, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা তুমি মার্ক্সে পাবে না। মার্ক্সের দার্শনিক মন এখানেও বিস্তর কুয়াশা সৃষ্টি করেছে।"

"মার্ক্সের উপর তোমার ভাব ভালো নয়—আর তাই নিয়ে তুমি আমাকে ক্যাপিটেল পড়িয়েছ। কাজেই আমি যে শিশিরের কাছে সৌখীন হব তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আমার হয়ত শ্রদ্ধাই নেই মার্ক্সের উপর, অথচ তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"মার্ক্সকে শাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে হয়ত বিপ্লব সম্ভব—যা রাশিয়ায় হয়েছে কিন্তু তার সমালোচনা করতে গেলেই মুস্কিল।"

"যাঃ—ও, তোমার কাছে আর ওসব আমি শুনতে চাই নে।" বনানীর আদর্শ-অনুরাগী মন রুখে দাঁড়াল।

পুরী থেকে এসে নিজেকে অস্বাভাবিক মুক্ত মনে হচ্ছিল বনানীর। পৃথিবীকে এত সুদূর বিস্তৃত, আকাশকে এত সীমাহীন আর কখনও সে কোনদিন অনুভব করে নি। আদর্শের পিছু খুসীমত সে যেখানে সেখানে যেতে পারে—শিশির, জেল থেকে বেরিয়ে এলেই সে গিয়ে দাঁড়াবে তার পাশে, সমাজের কাজের জন্য শিশিরকে তার প্রয়োজন—তার নিজের প্রয়োজনের জন্য আছেই ত সত্যবান। তার বাইরের জীবনে সত্যবানকে সে অনধিকার-প্রবেশ করতে দেবে না। আর তা দেওয়া উচিতও নয়। তাতে শুধু তার নিজেরই সর্বনাশ হবে এমন নয় সতীর উপরও অমানুষিক অবিচার হবে। সতীকে বনানী ভালোবাসে, তার জয় করবার একটা আশ্চর্য, গোপন শক্তি আছে। এই শক্তিই আছে যখন, সতীর আর ভয় নেই, ভয় থাকা উচিত নয়।

ঠোঁটে একটা সিগারেট চেপে সত্যবান বললে: "বেশ। তাহলে পুরীর গল্পই বল।"

স্যুটকেস খুলে চকোলেটের প্যাকেট খুলে নিল বনানী : "তা-ই বলব।"

"জগন্নাথের মন্দিরের গল্প কিন্তু নয়।"

চকোলেটের রাং-তার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বনানী বললে : "সেখানে আমি গেলে ত!"

"ও, তোমাদের ত আবার দেবদ্বিজে ভক্তি থাকতে নেই!"

"কেন? দ্বিজে ভক্তির অভাবটা দেখলে কোথায়?" মনোযোগ ভেঙে চোখে হাসি নিয়ে চাইল বনানী!

"যাক আশ্বস্ত হলুম।" সত্যবানও নিঃশব্দে হাসলে।

সতীর সঙ্গে সীতারাম নারায়ণগঞ্জ চলে গেলে—একটা ঠিকে ঝি নিয়েই ঠাকুরকে কাজ চালাতে হয়। ওদের তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়া সত্যবানের অভ্যাস, মনে মনে সত্যবান জানে ওটা বনানীর জন্য নয়। প্রায় পুরোপুরি এক-একটা রাত ছুটি পাওয়া যাচ্ছে আজকাল—ঠাকুরের তাই আহ্লাদের আর অন্ত নেই।

সত্যবান বাইরের ঘরেই ঘুমোবে—বেড্-রুমে বনানীর ঘুমোবার জায়গা হল।

"শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি, এতটা জার্নি হয়েছে শরীর নিশ্চয়ই ক্লান্ত।" সত্যবান একটা গার্হস্থ্য সৌজন্য দেখালে।

"এখন ঘুমোবো? ন'টায়? তাহলে খোকাখুকুদের মত রাত দুপুরেই জেগে উঠে ক্ষিদের চোটে চেঁচাতে শুরু করব।"

"তা হলে গল্প কর।"

"বকবক করতে আমার ভালো লাগে না। এইখানে আমি বসে থাকব—চুপ করে।"

"থাক।"

"তোমার কাছে।"

"বেশ।"

"চুপ করে থাকতে বেশ লাগবে না ?"

"হুঁ।"

"আলোটা নিভিয়ে দাও না—ঘরে জ্যোৎস্না আসবে।"

সুইচ-টা টেনে দিলে সত্যবান। ঘরে জ্যোৎস্না জ্বলে উঠল। আলমারীর কড়া বার্ণিশটা চিকচিক করছে, ঝিকিয়ে উঠল বনানীর কানপাশাগুলো। বনানী উঠে এসে গা ঘেঁসেই বসল সত্যবানের। এক মুঠো ফুলের মতই বনানীর একটা হাত সত্যবান তুলে নিল হাতে। নীচে থেকে ট্র্যামের শব্দ আসে—পুজোর ছুটির লেট-ট্র্যাম। মনে হয় অনেক নীচে সহর—তাকে ছাড়িয়ে তারা কোথায় উঠে এসেছে। আকাশ এত গভীর আর নীল—যেন জলে থৈ-থৈ করছে। জলের আলো এ জ্যোৎস্না। পুরীর সমুদ্রের ফস্ফরেসেন্স-এর চেয়ে ঢের উজ্জ্বল।

সত্যবান যেন অবশ হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। ক্লোরোফর্মের মতই একটা তীব্র ক্লান্তিকর নেশা যেন সে টেনে নিচ্ছে। অথচ তার সুরভি অগাধ। চশমার নীচেই চোখ তার বুঁজে এল। মনে পড়ে এম্নি একটা অনুভূতি সুরমাদির কাছেও একদিন পেয়েছিল সত্যবান—তাকে কিছুই করতে হয় নি, নিশ্চল হয়ে শুধু সে অনুভব করেছে—আজ সে নিজেই সৃষ্টি করছে সে অনুভূতি। কিন্তু তবু তা একই রকম যেন। একই রকম রক্তের উত্তাপ। মুহূর্তগুলোর গতি একই রকম। একটা যান্ত্রিক পীড়নে সত্যবান একটু আলগা করে নিলে তার হাত।

কিন্তু তা আর কতক্ষণ ? ঢেউ-এর পর ঢেউ আসছে—বালুর উপর ফেনা শুকোতে পারে না—আবার এসে ঢেউ উপস্থিত হয়। বনানীর হাতটা শক্ত করে ধরে এবার সত্যবান। ভাবে তার উত্তেজক, নরম

স্পর্শটা ভালো করে নিজের হাতে মেখে নেবে। নিংড়ে নিতে চায় তা থেকে সে সমস্ত কোমলতা।

সুইচ টিপে একটা কারখানাকে যেন গুঞ্জন-মুখর করে তোলা হল। হাতের কাছে বনানী বিদ্যুতের অবারিত প্রবাহ অনুভব করছে। সেখানে তার তীব্রতা বোঝা যায়—সমস্ত শারীর-যন্ত্রে আর তা নয়—শুধু বেগের আবেগ। নিজেই সে শুনতে পায় নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ। সে-শব্দের ছোট ছোট ঢেউ নিঃশব্দ উত্তাপের মত শির-শির করে উঠে আসে গলা পর্যন্ত—তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে চোয়ালের ধারে ধারে নরম মাংসের ভেতর, কাণের চারপাশে, গালে, নাকের দুপাশের শক্ত মাংসের পর্দায়, ঠোঁটে। প্রত্যেকটি অঙ্গ তার সজাগ, সচকিত, উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিসের অপেক্ষা করে যেন।

সত্যবান আরো নিবিড় হয়ে আসে—বাঁ-হাতে জড়িয়ে আনে বনানীকে। গাছের গতি অলক্ষ্যে ছুটে চলেছে সূর্যালোকের দিকে, তার সমস্ত অণু-কোষে সে-আগ্রহ। সমস্ত সত্তায় তেম্নি উন্মুখতা অনুভব করে বনানী। বাইরে তার চিহ্ন নেই। বোঝাতে বুঝি পারে না বনানী সত্যবানকে। সত্যবান কি বুঝে নিতে জানে?

জানে। সত্যবান চাইল বনানীর মুখের উপর। চোখে চশমা নেই—অনেক স্নিগ্ধ দেখায় তার চোখ। চাওয়ার উত্তরে চোখের সমান করে শুধু তুলে ধরল বনানী তার ঠোঁট। মৃত্যুর মুহূর্তের মত এ মুহূর্তগুলো—পৃথিবীর ধ্বনি আর দৃশ্য ঝাপসা হয়ে আসে—মুছে যায়। কিন্তু পরের মুহূর্তেই জীবনের দুরন্ত উৎসাহ। অসহ্য উত্তাপ সত্যবানের ঠোঁটে—তবু তা সওয়া যায়। বনানী নিঃশব্দে জীবনের উত্তাপ পান করে চলল। আগ্নেয়গিরি উদ্গারের জন্য আগুন সঞ্চয় করে নিচ্ছে। এখন তার অন্ধকারই ভালো লাগে—তার জন্য আকাশেও জ্যোৎস্না নেই।

ক্ষয় হয়ে আসে সূর্য—পৃথিবী যেন নয়—সমুদ্রের ঢেউ দিয়ে, তৃণাঙ্কুর দিয়ে পাহাড়ের চূড়া দিয়ে সূর্যকে সে জড়িয়ে ধরতে চায়। বনানী মিশে যেতে চায় সত্যবানের দেহে। তবু যেন ব্যবধান রয়ে গেল—অনেক অনেক ব্যবধান! মূর্চ্ছা ভেঙে জেগে ওঠে হঠাৎ সত্যবান—সত্যি, আরো নিবিড়তা পাওয়া যায় না কি, আরো গভীরতা। চোখ বুঁজে আছে বনানী, হয়ত ভয়ে, উচ্ছ্বাসের সমাপ্তির ভয়ে। বনানী মিশে যেতে পারে নি—সত্যবান তাকে টেনে নিতে পারে। বনানীর শরীরের সুঠামতা থেকে দৃষ্টি ঠিকরে আসে দ্বিগুণ ক্ষুধিত হয়ে। চোখের স্নায়ু ছিঁড়ে যেতে চায় সত্যবানের।

সত্যবানের রূঢ়তায় বিশ্বাস আছে বনানীর—আগুনের পথমুক্তি করতে সে জানে। বনানীর চেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চেষ্টা করেও সে এগুতে পারে না। তারপর আসে ভয়—ব্যবধান পাছে বড় হয়ে ওঠে। মনে হয় হিংস্রতাও ভালো—সত্যবানের হিংস্রতা। সেই কল্পিত হিংস্রতার কাছে বনানী নিজেকে সমর্পণ করে দেয়—স্তিমিত হয়ে আসে তার দেহের বেগবানতা। কিন্তু দেহের ভেতরে এখনো চলছে আগুনের হোরি খেলা—ইলেকট্রিক্‌ স্পার্ক অবিরাম ফেটে পড়ছে।

শিথিল-প্রায় বনানীকে তুলে আনে সোফার উপর সত্যবান। ভাবে, জ্যোৎস্নার আর দরকার নেই—জানালাটা এখন বন্ধ করে দেওয়া যাক।

বারো

২১ জুন, ১৯৪১। রাত্রি ১০টা
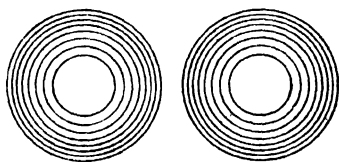
আকাশে দৃষ্টি মেলে দিলে পথের আর শেষ নেই! কিন্তু সে-পথ কি সত্যবানের জন্য তৈরী? নিজেকে নিয়ে তার সত্যিকারের পরিবেশে ফিরে এলে সে-পথ বুঝি আর দেখা যায় না। জীবনের একটা সঙ্কীর্ণ গলিতে মাত্র সে চলাফেরা করছে: পরিচয় হয়েছে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে—মিস্টার সেন, মাস্টার মশাই, রজত, সুরমাদি—ছোট একটা মানুষের দল—তারা পুরোনো হয়ে একে একে ঝরে গেছে তার জীবন থেকে। সতীও এদের মত নতুন ছিল একদিন—ব্যবহারে পুরোনো করে তাকে অনেক সময়ই ফেলে গেছে সত্যবান অনেক পেছনে। কিন্তু পেছনেই কি তাকে সে রেখে গিয়েছিল? কি করে আবার তবে তার সঙ্গে সতীর দেখা হয় আজ? এখনও সে একা নয়, নিঃসঙ্গতার ভয়ে সে পেছনে ফিরে আসে নি। বনানী আছে তার—তাকে নিয়ে দীর্ঘ সোজা পথে অনেকদূর যাওয়া যায়। বনানীকে পেছনে ফেলে যাবার শক্তি তার নেই, নেই দৃষ্টি, নেই সাহস। বনানীই তাকে পেছনে রেখে ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে যেতে পারে। তারপর? আর কেউ নেই। নতুন আলো চোখে নিয়ে আর কেউ তার জীবনে উঁকি দেয় নি। কিন্তু আলো কি সে গ্রহণ করতে জানে? নিজেকে সত্যি বিচার করলে মনে হয় একেক সময়, একটা জড় শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিয়ে তার জন্ম

—নিরেট স্থূল অন্ধকার—তাই প্রত্যেকটা আলোর পথ তার জীবনে দীর্ঘ বাঁক নিয়েছে—আলোর স্বাভাবিক উদ্ভাস সত্যবান জীবনের মধ্যে ধরতে পারে নি। দীর্ঘতম বাঁক এনে উপস্থিত করেছে বনানী—যেখান থেকে বনানীকে আর দেখা যায় না—দেখা যায় সতীকেই আবার।

একটু অস্থির হয়েই সত্যবান ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল। সতী নেই। কখন উঠে চলে গেছে। মনে পড়ল তার খাবার আনতেই গেছে সতী—একসঙ্গে বসে খাবে। তার স্থূল উপস্থিতিকে অন্ধকারও মুছে দিতে পারে না। এই অন্ধকারেও বুঝি জেগে আছে সতীর সজাগ দৃষ্টি। সজাগ দৃষ্টি! মায়ের মতন! অনুভূতিটাকে ঘিরে ঘন হয়ে আসে মন।

কিন্তু এ-অন্ধকারের আরেক চেহারাকে কি করে ভুলতে পারে সত্যবান? এ-অন্ধকারে একদিন বনানী ছিল—ছিল জ্যোৎস্না—আর সে। সম্পূর্ণভাবে, নিশ্চিতভাবে বনানীকে সে পেয়েছিল সে-দিন। একটু ফাঁকি ছিল না, ছিল না সামান্য ব্যবধানও। শুধু যে তাদের দেহই গলে এক হয়ে গিয়েছিল তা নয়—সত্যবানের মনও মিশে গিয়েছিল বনানীর মনে। বনানীর সঙ্গে সে যেতে পারত অনেক দূর—বনানীর আদর্শকে নিজের আদর্শও করে নিতে পারত। কিন্তু বনানীই তাকে থামিয়ে দিয়েছে—হয়ত বনানী জানত, থেমে যে সে যেতই।

এই ঘর, এই অন্ধকার। সব এক। একই দৃশ্য থাকে তবু অভিনেতার পরিবর্তনে আবহাওয়ার কত পরিবর্তন! মনে হয় না এখানে বনানীর জন্য কোনদিন স্থান ছিল—সতীর স্বাদে ভরে আছে সমস্ত বাড়ির হাওয়া। দৃশ্যই যেন বদলে গেছে অন্যরকম হয়ে।

সতীর প্রতি এই রূঢ়তার সত্যি কি মানে হয়? স্বাধীনতা নিতে

চায় না বলে কি তার এই আক্রোশ ? নিজের ভালোমন্দের দৃঢ় ধারণা নিয়ে সতী যদি আজ স্বাধীন হয়ে ওঠে, এমন কি বুদ্ধিতে, মানসিক প্রকর্ষে সত্যবানকে ছাড়িয়ে যায়—ভালো লাগবে কি তাকে সত্যবানের ? বনানীকে কি একেক সময় অসহ্য মনে হয় নি তার—বনানীর উজ্জ্বলতার কাছে যেখানে সে ম্লান হয়ে পড়েছে ? সত্যবান মাত্র এইটুকু চায় সতী তাকে বুঝতে পারুক, তার নাগাল পাক—যাতে তারও মতামতের একটা মূল্য থাকে সত্যবানের কাছে। শিল্পী চায় না রসবোদ্ধারা তারই মত প্রতিভাবান হোক, রস বুঝবার ক্ষমতা তাদের থাকলেই সে খুশি—তাতে আশ্রয় করেই সে দিন দিন সৃষ্টির ঔৎকর্ষ দেখাতে পারে। এ-ও এক ধরণের নার্সিসাস-বৃত্তি, যারা অবিবাহিত, তাদের মত উগ্র না হলেও এ বৃত্তি সহজে বিবাহিত পুরুষদের ছেড়ে যায় না। বিয়ে না করার মধ্যে বাহাদুরী নেই—ওটা দুর্বল আত্ম-প্রাধান্যের একটা রক্ষা-কবচ—মেয়েদের সম্বন্ধে একটা নিওরোটিক ভয় থাকে অবিবাহিতদের, পাছে স্ত্রীর চোখে ছোট হয়ে পড়ে সেই ভয়। বিবাহিতদের কমপ্লেক্স—স্ত্রীর চোখে বড় হওয়া চাই—স্ত্রীর মতের মূল্য তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি, ছেলেবেলায় যেমন মায়ের মতের মূল্য। অত্যাচারী দুর্ধর্ষ চ্যাং কাইশেককে রাশ টেনে সংস্কৃতিবান করে তুলেছে ম্যাডেম চ্যাং কাইশেকের শিক্ষিত মন। মননশীল স্ত্রীর সাহচর্যে হিটলারেরও এই অবস্থাই হত—খেলার পুতুল স্ত্রী না পেলে মুসোলিনিরও। মেয়েদের মতের মূল্য পুরুষরা স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবেই গ্রাহ্য করতে চায়—তাই ডিক্টেটর-শাসিত রাজ্যে মত তৈরী করবার সুযোগই মেয়েদের দেওয়া হয় না, তাদের জন্য তাই সেখানে শুধু আতুরঘর আর রান্নাঘরই নির্দেশ করা হয়েছে। মেয়েদের একবার স্বাধীনতা দিয়ে আবার তাদের রাষ্ট্র-নির্দ্ধারিত শৃঙ্খলায় আনা কঠিন—কারণ দৈহিক-পীড়ন মেয়েদের উপর পুরুষরা সহজে করতে পারে না

—ওটা প্রকৃতি-বিরোধী ; পুরুষ-জানোয়ারও মেয়ে জানোয়ারকে আক্রমণ করে না। মেয়েদের মতরোধ করা-ই তাদের চরম শাসন।

সত্যবান স্ত্রীর মতের মূল্য দিতে চায় কিন্তু স্ত্রৈণ হতে চায় না। নিজের চেয়ে সব বিষয়ে খাটো যে স্ত্রী তার মতের মূল্য দেওয়াই স্ত্রৈণতা। অশ্লীল আচরণকে ঘৃণা করে সত্যবান। সব ক্ষমতাই হয়ত সতীর আছে—সে একটু নিজ সম্বন্ধে সচেতন হোক—ততটুকু সচেতন যাতে সত্যবান নিজের মনের পোশাকটা অবিকল সতীর মন থেকে দেখতে পায়। এটুকুও কি সতী পারে না ?

ঘরে আলো জ্বলে উঠল। সীতারামকে দেখা গেল কাচের দুটো জলের গ্লাস নিয়ে হাজির। কোথায় এ-গুলোকে রাখা যায় বেচারী বুঝে উঠতে পারছিল না।

সত্যবান টেবিল থেকে কাগজপত্রগুলো সরিয়ে বললে: "এইখানে রেখে যা—"

খাবার নিয়ে এল ঠাকুর—দুজনের মত। তারপর এল সতী।

"অনেক দেরী হয়ে গেল—" একটু খুশির হাসিই যেন সতী সত্যবানের কাছে পৌঁছে দিলে।

"দেরীর অপরাধ নেই—যা আয়োজন দেখা যাচ্ছে।" সহজ হতে গিয়েও খানিকটা সঙ্কোচ থেকে যায় সত্যবানের।

"জানো আজ কি তারিখ ?"

দেয়ালে ঝুলানো টাটার ক্যালেণ্ডারের দিকে চাইল সত্যবান। কিন্তু তারিখটা জানিয়ে দিলে সতীই : "একুশ জুন।"

"হলই বা। তাতে এত চব্যচোষ্যের কি দরকার হল! বার আর তিথিতে বাংলা পঞ্জিকায় ভক্ষণ-নিষেধই লেখা থাকে জানি।"

"একুশ জুনের কথা ভুলে গেছ—পনেরো বছর আগেকার একুশ জুন ?"

"ওঃ" সত্যবান একটু হাসলে : "দু-তিন বছর ঠিক মনে ছিল।"

"প্রত্যেকটা একুশ জুনই আমার মনে পড়ে।"

"কোথায় মনে পড়ে? আর মনে পড়লেও লাভ কি হচ্ছে? একুশ জুন তুমি জীবনের সবচেয়ে বড় সাহস দেখিয়েছিলে।"

"তোমাকে বিয়ে করা-কে আমি সাহস বলি নে—ওটা স্বাভাবিক ছিল।"

"তোমার মা মত দেন নি—বাবা মত দিলেও উপস্থিত থাকেন নি—তবু তোমার সাহস ছিল না বল?"

"তুমি যা খুশি তাকে বলতে পার।"

"তুমি মানবে না?"

"না।"

সত্যবান হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল : "বেশ। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছ কেন? একসঙ্গেই ত খাবার কথা ছিল।"

সতী সত্যবানের কাছ ঘেঁষেই বসল : "আমি কি খেতে চাই নে?" সতীর মাংসল মুখেও এমন একটা রেখা ফুটে উঠল যা দেখলে মমতা হয়। দেখতে ভালো লাগছে সত্যবানের। বুদ্ধির ভালো লাগা নয় —অহেতুক ভালো লাগা।

"খেতে চাওয়াটাই তোমার স্বাভাবিক।"

"সবসময়ই আমার ভয় পাছে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ি। ভয়, পাছে তুমি মনে করো তোমার সয়ে যাওয়ার সুযোগ আমি নিচ্ছি।"

"আমার পক্ষে তোমার ব্যবহার দুর্বহ হবে তুমি ভাবতে পার?"

"অনেক সময় ভেবেছি।"

"কখন?"

"আগে বনানী এলেই ভাবতুম আমি বুঝি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেললাম।"

"বনানী এখনো আসে।"

"এখন আর ভাবি নে। দুর্ব্যবহার করবার ভয় আমার নেই। আমি দেখেছি তোমাকে আমি কোথাও আঘাত করি নি। তাই তোমাকে হারাবার ভয় আমার চলে গেছে।"

যৌন-ঈর্ষার রূপান্তর এ ভাবেও যে হতে পারে সত্যবান তা কল্পনাও করতে পারে নি। সতীকে মনে করেছে সে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পাথরের মত স্থির অথবা নির্বোধ। মনে মনে সতীর কাছে সে পরাজয় স্বীকার করে নিল—এ-পরাজয়ে রূঢ় জয়ের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ। ভুল ভাঙার অপরিসীম আনন্দ। সতীর শুধু দেহই নেই, আছে মন, আছে মনন।

"বেশ! হাত তুলে বসে আছ। খাও।" সত্যবান সতীর ভূমিকা অভিনয় করতে শুরু করলে।

"বাঃ, তুমিও ত খাচ্ছ না।"

"উঁচু টেবিলে অনভ্যাসের অসুবিধে আছে।"

"থাক। তবু বেশ লাগছে।"

"তুমি ভাবতে পার, পনেরো বছর পেছিয়ে গেছ?"

"পারি। অনেকদিন তা ভাবি-ও।"

"আমি পারি নে। অতীতটাকে কেমন রোগা, অস্বাস্থ্যকর মনে হয়।"

"কিন্তু তা যে সত্যি, তা-ত তুমি বলতে পার না?"

"বলতে পারি! তখন যা সত্যি বলে মনে করেছি, আজ বলতে পারি তা কতটুকু মিথ্যে।"

"আমিও কি তোমার কাছে মিথ্যে?"

"আমি জানি তুমি সত্যি—কিন্তু নিজেই তুমি মিথ্যে হয়ে যাচ্ছিলে।"

"ওটা তোমার ভুল। মিথ্যার উপকরণে আমি তোমাকে পাই নি—মিথ্যা আমার জীবনে ঠাঁই পাবে না।"

"পুরুষদের রোমান্টিসিজ্‌ম্ একটা ভড়ং—মেয়েদের আকর্ষণ করবার একটা ছল। পুরুষ-ময়ূরের পুচ্ছ,পুরুষ-কোকিলের কণ্ঠ থাকে মেয়েপাখীদের আকর্ষণ করবার জন্যে—সে-সজ্জা বা সে-গুণ ত প্রকৃতি মানুষকে দেয় নি—তাই তার রোমান্টিসিজ্‌মের পোশাক পরতে হয়। তার উপর যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হল তাতে কি ফাঁকি থাকতে পারে না বল!"

"রোমান্টিসিজ্‌ম্ ত কারখানায় তৈরী পিগ্‌মেণ্ট রং নয় যে ফিকে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তার আছে। ওটা মনের রং, জীবনকে মৃত্যু পর্যন্ত তা রাঙা রাখতে পারে। রবিঠাকুরের জীবনকে তুমি মিথ্যে বলতে পার?"

সত্যবানের তার্কিক সত্তা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সতীর সান্নিধ্যে তৃপ্তি পেল।

"কালিয়া-টা চমৎকার হয়েছে।"

"ঠাকুর চমৎকারই রাঁধে আজকাল।"

"উঁহু—এতে তোমার হাত আছে।" সতীকে প্রশংসা করবার জন্য উদগ্রীব হল সত্যবান।

"থাকলই বা।" এতটা খোলাখুলি ভাবে সতী প্রশংসা গ্রহণ করতে নারাজ। একটু আহত হল সত্যবান। বহুদিন সে আঘাত পায় নি। ভালোই লাগে আঘাতটা। সতী আগেকার কথাটাকেই টেনে আনলে আবার: "আমার বরং দুঃখ হয় আগের মত আর আমি রোমান্টিক নেই বলে।"

"তাহলে তোমার জীবন ভরা আছে তা-ই বা ভাব কি করে?"

"সেখানে যতটুকু খালি পড়ছে, ততটুকু ভরে তুলছে স্বামী আর ছেলেমেয়ে।"

"স্বামীর মধ্যে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ খুঁজে পাও ?"

"রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ না-ই বা পেলুম। তার ত অন্য একটা রং আছে। তা ত ভালো লাগতে পারে।"

"অনেকের ভালো লাগে না—"

"ভালো লাগবার মত স্বামী হয়ত তারা খুঁজে পায় নি।" নিজের মনেই হাসল সতী।

অন্য কোনো সময় এ-হাসিকে নির্লজ্জ বলে ব্যাখ্যা করতে পারত সত্যবান। কিন্তু এখন আর তা মনে হল না। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই যেন সতী অদ্ভুত বদলে গেছে। এ কি তার আত্মরক্ষা ? আত্মরক্ষা করতে কি সতী জানত ? সত্যবানই হয়ত তাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে সচেতন করে দিয়েছে। কোনদিনই হয়ত সত্যবান চায় নি যে সতী ঘুমিয়ে থাকুক। বনানীর দেহের স্পর্শেও বুঝি অনুভবের এ-দৈন্যই বোধ করেছে যে সতীর দেহে এ-উত্তাপ নেই কেন। বনানীর সত্তায় সে সতীরই মুক্ততর সত্তার আস্বাদ নিতে গেছে বারবার। সতীর কক্ষ থেকে মুক্তই যদি সে হতে পারত—সুরমাদির কাছ থেকে পালিয়ে আসতে পারত না একদিন। রজত বাঁচাতে না চাইলেও সে বাঁচাতে পারত সুরমাদিকে। কি দরকার ছিল বনানীর ! বনানীর মুক্ত জীবন ধারার আকর্ষণ ? তা-ও হয়ত নয়। সতীর সঙ্গে যে রোমাঞ্চময় মুহূর্ত সে অতিবাহিত করেছে পনেরো বছর আগে, বনানীকে অবলম্বন করে হয়ত সত্যবান তারই পুনরাবির্ভাব দেখতে চেয়েছিল।

"খাওয়া হয়ে গেল ?"

"এম্নিতেই বেশি খেয়েছি।"

"হুঁ—খুব খেয়েছ। 'পিঁপড়ে কাঁদিয়া যায় পাতে'।"

"বিয়ের এনিভার্সারিতে তুমিও ত পেট ভরে খেলে না !"

"পেট ভরে খাবার জন্যে বিয়ের আমার দরকার ছিল না, মনকে ভরে তুলবার জন্যই দরকার ছিল তার।" তাড়াতাড়ি কথাটা বলেই আঁচাবার জন্য উঠে গেল সতী : "হাত ধোবার জল তোমার এখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সতী চলে গেলে সত্যবান আবার একা। ঘরে আলো আছে—নিঃসঙ্গতাকে নিবিড় করে তুলবে না। ব্যথিত মন নিয়েই সত্যবান বনানীকে স্মরণ করে। মাঝে মাঝে আসে বনানী—শাণিত, রুক্ষ অথচ ক্লান্ত চেহারা নিয়ে। পরিশ্রান্তই হয়ে আসে সে, একটু বিশ্রাম নিতে সত্যবানের কাছে। জেল থেকে ফিরে এসেছে শিশির—আবার 'লেবার সেল্'-এ তার কাজ শুরু হয়েছে—এবার বনানীও তার সঙ্গে। নিষ্ঠুর সেই সঙ্গ, তাতে উত্তাপ নেই, রোমাঞ্চ নেই—শুধু পরিশ্রম—আদর্শের পেছনে পণ্ডশ্রমই কিনা কে বলবে! সে জীবন থেকে মাঝে মাঝে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে আসে বনানী—এখানে, সত্যবানের পাশে বনানীর প্রখর চোখে ঘন হয়ে আসে ছায়া, ঠোঁটের দৃঢ়তায় আসে চটুলতা—বর্ষার স্নিগ্ধতা যেন সমস্ত শরীরে। সত্যবানও যায় টালিগঞ্জে বনানীর ছোট ঘরখানিতে। প্রাণপণে হয়ত বনানী তখন মুখস্থ করছে 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'—সত্যবানের আবির্ভাবে উজ্জ্বল, প্রখর স্পষ্ট বনানী রহস্যময় হয়ে পড়ে। কি অপরাধ বনানীর—নিজেকে খণ্ডিত করে কেন তাকে রাখতে হয়? কেন পারে না সত্যবান বনানীর আদর্শকে স্পর্শ করতে—কেন চায় না শিশির বনানীর মনকে সন্ধান করে নিতে? কেন? কেন?

জল নিয়ে এল সীতারাম। সত্যবান হাত মুখ ধুয়ে নিলে। টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেল। একটা সিগারেট নিয়ে টেবিলে ঠুকতে লাগলে সে। সতী আর এখন হয়ত আসবে না। পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার আকাশ। অবিশ্যি নিজের কাছে তার আকাশ সবসময়ই পরিচ্ছন্ন ছিল।

নিজের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে দেখা শুধু চোখের দৃষ্টিতে হয় না—তার জন্য প্রাণের উচ্ছ্বাস চাই। সে উচ্ছ্বাস আসে রক্ত-মাংসের জীবন থেকে, বিচার-বুদ্ধিতে মাপা শীর্ণ-জীর্ণ জীবন থেকে নয়। ধন্যবাদ জানাক সতী প্রাক্-সামরিক পৃথিবীর জলবায়ুকে, যে-পৃথিবী মানুষের জীবনে প্রচুর রক্ত-মাংস দিতে পেরেছিল। তখনও যারা পরিপূর্ণভাবে রক্তমাংস আহরণ করে নেয় নি, মানুষের ইতিহাসে বিদ্রোহীর খ্যাতি পেলেও তারা নিজের জীবনের কাছে জবাবদিহি দিতে পারে নি। সে-আবহাওয়ার মানুষ হয়েও সত্যবান তার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, উত্তর-সামরিক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছে। সেখানে কুয়াশা, সেখানে গোধূলি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে, কিন্তু দৃষ্টি কেবলি হারিয়ে যায়। অনেক জিজ্ঞাসা বীজাণুর মত বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের রক্ত-মাংসের সত্তা সেখানে বাঁচতে পারে না, শুধু তর্কে, শুধু প্রশ্নে, শুধু কথায় তৈরী জীবনের অনেকটা অংশ। সত্যবানের জীবনের অর্ধেক সময় শুধু কথার ফানুসে লাল-নীল। সে যেখানে এসে এখন পৌঁছেছে—সেখানে জিজ্ঞাসার জটিলতা আরো কঠিন—ঘনিয়ে আসছে ক্রমেই অন্ধকার। জীবনের এ-গতিপথ চলেছে হয়ত রাত্রির দিকে—দুর্বহ, দীর্ঘ রাত্রি। এই রাত্রির শেষে আসবে কি না প্রভাত কে বলবে? রাত্রির পথিকেরা দেখতে পাবে কি কোনো সূর্যোদয়—জীবনপ্লাবী মুক্তির সূর্যোদয়? সমুদ্রের নীচে প্রবাল-কীটের মত কি এরা অস্থি জমিয়ে যেতে পারছে, যাতে সত্যি একদিন জেগে উঠতে পারে প্রবাল দ্বীপ? তাহলেও সার্থক বনানীর ব্যথা, শিশিরের কঠোরতা। জীবনের বন্ধ্যাত্ব দিয়ে তারা পৃথিবীর মাটিকে উর্বর করে যাক। তবু থেকে যাবে পৃথিবীর গায়ে এ-জীবনের স্বাক্ষর। কিন্তু সত্যবান রেখে গেল কি কিছু? তার মৃত্যুতে উবে যাবে কতকগুলো কথা,

মুছে যাবে খানিকটা দ্বিধা। কথার মায়াজালকেই সে জীবনের উন্নত রূপ বলে ভুল করে এসেছে। তা তার জীবন নয়—তার জীবনের শিকড় অনেক নীচুতে, মাটির অন্ধকারে। কিন্তু মাটির অন্ধকারকেই সে ভয় করে এসেছে এতদিন।

সত্যবান ক্ষিপ্রহাতে ড্রয়ারের ডালাটা খুলে ফেললে। বহু-ব্যবহৃত বহু-পরিচিত সেই চিঠিগুলো। জীবনের কতকগুলো ধাপের ফটোগ্রাফ—। একের পর এক চিঠিগুলো জড় করে ছিঁড়তে লাগল সত্যবান। মার চিঠি, ছেলেবেলাকার বন্ধুদের চিঠি, মাস্টার মশাইর, সুরমাদির, বনানীর চিঠি। সতীর চিঠিও—তারও বা প্রয়োজন কি? সে ত তার সামনেই জেগে আছে দিনরাত। ছেঁড়া চিঠির একটা বিরাট স্তূপ দু'হাতে ঠেলে জানালা দিয়ে ফেলে দিলে সত্যবান। ফিরে এসে আলো নিভিয়ে দিলে।

কান্নার মত একটা মৃদু ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সত্যবান থমকে গেল। ভুরু কুঁচকে উঠল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তমাত্র। তারপরই একটা ফিকে হাসিতে বাঁকা হয়ে উঠল তার ঠোঁট। সতীই বুঝি গুণ-গুণ করে একটা গানের সুর টানছিল।